দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৯ম সংখ্যা ❖ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- এলোমেলো কথা : নেপালে গণতন্ত্রের জন্যে নতুন অন্বেষণ ২
- নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধানে নেপাল ৩
- বিশেষ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নাকি নাগরিকত্ব হরণ? ৪
- অনুপর্ণা রায় : ভেনিসেও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি পুরুলিয়া ৬
- সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিতে চলেছে ৭
- অথ রোহিঙ্গা উপাখ্যান ৯
- শ্রদ্ধাঞ্জলি : আচার্য বিনোবা ভাবে এক বিরল সমাজ সংস্কারক ১১
- ইরান : জানা-অজানা কিছু কথা ১৩
- স্মরণ : বদরুদ্দিন উমর ১৫
- ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা এবং বদরুদ্দিন উমরের ব্যাখ্যা ১৬
- জি এস টি সংস্কার অবশেষে মোদী পিছু হঠতে বাধ্য হলেন ১৯
- বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে : ওমর খালিদের জামিন আবেদন খারিজ ২১
- স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ২২
- আইন আর আদালতের গেরোয় ওয়াকফ সম্পত্তি ২৪

➲সম্পাদকীয়

তিনি বিশ্বগুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই দামোদর দাস মোদীকে তাঁর ভক্তকূল 'বিশ্বগুরু' আখ্যায় ভূষিত করেছিল। সারা পৃথিবী পর্যটন করে এবং তাঁর দলের সুনিপুন প্রোপাগান্ডা যন্ত্রের সাহায্যে তিনি একটি বিশাল অন্ধ ভক্তকূল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে ইদানিং বিশ্বগুরুর সময় খুব ভালো যাচ্ছে না তাঁর গুরুদেব মার্কিন মুলুকের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সাহেব বিশ্বগুরুকে যেভাবে বেইজ্জত করেছেন তাতে ভক্তকূল খুবই বিমর্ষ হয়েছেন। ট্রাম্প সাহেব রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেলকেনার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০% শুল্ক বসিয়েছেন ও পাকিস্তানকে কোলে নিয়েছেন। বিশ্বগুরু এতবার নমস্তে ট্রাম্প বললেন, আপ কি বার ট্রাম্প সরকার করলেন, তার প্রতিদান এই? যাইহোক বিশ্বগুরু এবার আবার চিনা প্রধান শি জিনকে ধরেছেন। সাত বছর পর চিনে গিয়েছেন। ২০২০ সালে চিনা সেনার আক্রমণে গালওআন উপত্যকায় ২০ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যুর কথা তিনি মনে রাখেননি।

তিনি বিশ্বগুরু, অতঃপর এই উপ মহাদেশে একটিরপর একটি দেশে রাজনৈতি কপট পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি নির্বিকার দর্শক। দেশের বিদেশ মন্ত্রক অসহায়। বিশ্বগুরু সর্বদাই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে তিনি ইশ্বরের প্রতিনিধি। গত নির্বাচনেরআগে প্রচার করা হয় বিশ্বগুরু পিতা মাতার সন্তান নয়, তিনি ইশ্বরের সন্তান। তিনি ভোটের স্বার্থে নিজের মা বাবাকে অস্বীকার করতে পারেন। এখন তিনি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের নির্বাচন সামনে রেখে 'অনুপ্রবেশ 'প্রধান সমস্যা বলে প্রচার শুরু করেছেন। তিনি ১১ বছর ক্ষমতায়। এতদিন কী করছিলেন? কেনো তিনি ২০২১ সাল থেকে জনগণনা বন্ধ করে রেখেছেন? এখন নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করার নামে নাগরিক তালিকা প্রস্তুত করতে চাইছে। উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু, দলিত, পিছনের সারিতে থাকা মানুষের নাম বাদ দেওয়া।

তবে এই সঙ্কটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশের নির্দেশ রুখে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে এক আরটিআই আবেদনের প্রেক্ষিতে সিআইসি জানিয়েছিল, ১৯৭৮ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা পরিদর্শনের অনুমতিদেওয়া হবে। সেই তালিকায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতেই সিআইসি-র নির্দেশেস্থগিতাদেশ জারি করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। বর্তমান রায় কার্যত সেই স্থগিতাদেশ।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

এলোমেলো কথা

নেপালে গণতন্ত্রের জন্যে নতুন অন্বেষণ

শুভ বসু

আমরা যদি টাইম মেশিন করে ১৯৫০ সালে চলে যাই তাহলে দেখবো নেপালে রানা শাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ১৮৪৫ সালে থেকে রানারা ছিলেন নেপালের বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রী। ১৭৬৮/৬৯ সালে পৃথি নারায়ণ শাহর নেতৃত্ব কাঠমান্ডু উপত্যকা একত্রিত হয় এক রাজবংশর অধীনে। কাঠমান্ডু উপত্যকার গোর্খা জেলা থেকে উদ্ভূত এই রাজবংশ ছিল ঠাকুরী জাতির ক্ষেত্রী। নেপালের নতুন রাজারা হিমালয় দখলের অভিযান চালান। তাঁরা তিব্বত দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তাঁরা সিকিম দিয়ে ভুটান এবং বর্তমান ভারতের উত্তরায়খণ্ডের জন্যেও লড়াই করেছিলেন। সেই সময়ে ভারতে পূর্বাঞ্চল থেকে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করছে উত্তরে আর নেপালের রাজারা সারা হিমালয় পদানত করতে চাইছেন তাদের অধীনে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে এবং ১৮১৪ থেকে ১৮১৬ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নেপালের মহারাজদের যুদ্ধ হয় জ্জ সুগোলির চুক্তিতে পরাজিত নেপাল তাদের সীমান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং হয়ে পরে এক ডিপেন্ডেন্ট দেশ।

নেপালের যখন আর রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা নেই এবং রাজ দরবারে বসে আছেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট নেপালে শুরু হয় ঘরোয়া কোন্দল। সেই কোন্দলে ১৮৪৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর কোট গণহত্যা হয়। জঙ্গ বাহাদুর রানা এবং তার ভাইরা কাঠমান্ডুর কোট অস্ত্রাগারে প্রধানমন্ত্রী ফতেহ জং শাহ সহ নেপালের প্রাসাদ দরবারের প্রায় ৩০-৪০ জন সদস্যকে হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনার ফলে রানা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে রানা পরিবার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং রাজা হয়ে যান একান্ত ভাবে প্রতীকী রাজা। ভারতের মারাঠা কনফেডেরাসি তে পেশোয়ারা ছিল মূলত রাজার পরামর্শদাতা কিন্তু তাঁরা কালক্রমে ক্ষমতা দখল করে নেন বা জাপানে তোকুগাওয়া শোগুনরা ক্ষমতা দখল করে নেন ১৮৫৬ সাল অবধি । নেপালে একধরনের সমতলতান্ত্রিক ব্রাহ্মণবাদী শাসন প্রণীত হয় রানাদের নেতৃত্বে। ১৮৬৭ সালে নেপালে রানারা করেন মুলুকি আইন। নেপালের রানাদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশদের সম্পর্ক ভালো ছিল। ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহে নেপাল ব্রিটিশ সরকার কে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে যার ফলে শুরু হয় গোর্খা ব্রিগ্রেড।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ দের ভারত ত্যাগের পর রানা শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ ১৯৫১ সালে নেপালে রাজ্যতন্ত্রর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রানা শাসন শেষ হয়ে যায়। দিল্লি সেই সময় রানা শাসন থেকে পলাতক রাজা ত্রিভুবন নারায়ণ কে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে। দিল্লির আশা ছিল নেপালে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক। নেপালে সেই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরী হয়েছে নেপালি কংগ্রেস। আর পুস্পলাল প্রমুখ মার্ক্সবাদী নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৈরী হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৫৯ সালে নেপালে প্রথম নির্বাচনে বিশ্বেস্বর প্রসাদ কৈরালার নেতৃত্বে নেপালি কংগ্রেস ক্ষমতায় আস। কিন্তু নেপালি কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার নীতির ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশের সামন্ত প্রভুরা রাজা মহেন্দ্রের কাছে দরবার করেন এবং ১৯৬০ সালে রাজা মহেন্দ্র নির্বাচিত সরকার সরিয়ে রাজতন্ত্র সার্বিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বেস্বর প্রসাদ কৈরালা সারা জীবন প্রায় বন্দি হয়ে থাকেন নেপালে। ১৯৯০ সালে এক গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নেপালের রাজতন্ত্রর পতন হয় । ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ব নেপালের ঝাপা অঞ্চলে খড়গপ্রসাদ ওলির নেতৃত্বে নকশালবাড়ির প্রভাবে একটি আন্দোলন হয়। এর আগে থেকেই নেপালে কমিউনিস্ট আদ্যলন ছিল। কিন্তু আশির দর্শকে নানাবিধ ঘটনা পরম্পরায় নেপালে তৈরী হয় একত্রিত মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী (এমালে) দল। নেপালি কংগ্রেস এবং এমালে মূল দল হলেও ১৯৯৬ সালে নেপালে শুরু হয়ে যায় জনযুদ্ধ। একদল মাওবাদী মনোভাবাপন্ন তরুণ কমিউনিস্ট শুরু করেন এই আন্দোলন।

নেপালে জনযুদ্ধ বলতে মাওবাদী বিদ্রোহকে বোঝায়, যা ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এক দশকব্যাপী সশস্ত্র সংঘাতের সমতুল্য, যেখানে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে একটি গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিল, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। বিদ্রোহের অবসান ঘটে ব্যাপক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে, যার ফলে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং নেপাল একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর গণপরিষদ এক নতুন রাষ্ট্রপতি রামবরণ যাদবের নেতৃত্বে নেপাল ২০১৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তার নতুন সংবিধান গ্রহণ করে।

নেপালে গণতন্ত্র প্রশ্নবিদ্ধ হয় ক্রমাগত সরকার পরিবর্তনের ফলে। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদী নেতা পুষ্প কুমার দহল এবং এমালের নেতা খর্গপ্রসাদ অলি এবং নেপালি কংগ্রেসের নেতা শেরবাহাদুর দেওবা প্রায় musical chair এর মতো ক্ষমতায় আসেন এবং যান। তাঁদের মধ্যেই জোটভাঙা গোড়ার খেলা চলে। নেপালের অধিকাংশ যুব শক্তি দেশের বাইরে অভিবাসনকারী শ্রমিকের কাজ করে দিন গুজরান করেন। তারফলে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে বর্তমান গণ আন্দোলনে। ইতিপূর্বে ১৯৫১ সালে গণ আন্দোলন, ১৯৯০ সালে গন আন্দোলন এবং ২০০৬ সালের গণ আন্দোলন অনেকাংশে সরকারি দমন পীড়ন মুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমান গণ আন্দোলন এর উপর

পুলিশ নির্য্যাতন করেছে। এবং ১৯ জন মারা গেছেন। অতীতের আন্দোলন ছিল মূলত রাজনৈতিক দল কেন্দ্রিক কিন্তু বর্তমান আন্দোলন একেবারে ছাত্র ছাত্রী এবং যুবদের গণ আন্দোলন রাজনৈতিক দলের উপস্থিত এতে নেই।

নেপাল সম্পর্কে জানতে আমার আর আলী রিয়াজের রচিত গ্রন্থ টি পড়ুন Paradise Lost State Failure in Nepal.

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধানে নেপাল

মনিরুল হক

হিমালয় কন্যা নেপালের প্রতি আমাদের আগ্রহ অন্তহীন। সুউচ্চ পর্বতমালা, গিরিখাত, বরফগলা জলে পুষ্ট দুধরঙা নদী, সবুজ প্রকৃতি, মনোরম আবহাওয়া দেশটিকে অনন্য করে তুলেছে। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে ভারত-নেপাল সীমান্তের বিস্তৃতি কম-বেশি ১৮০০ কিলোমিটার। কিন্তু উত্তরে এভারেস্ট থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ন অঞ্চলে উভয় দেশের মানুষের যাতায়াতের জন্য কোনও পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় না। লক্ষ লক্ষ নেপালের মানুষ ভারতে বসবাস করেন। ভারতবাসীরাও নেপালে অবাধে ঘোরাঘুরি করতে পারেন। চাকরি ও ব্যবসা করতেও কোন বাধা নেই। অন্যসব প্রতিবেশি দেশ যথা চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করলে এই ব্যবস্থায় অবাক-ই হতে হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে কারণে নেপাল আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করছে তা হল তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন। সেপ্টেম্বরের ৮ ও ৯ তারিখ জুড়ে দেড় দিনেরও কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত এক হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের ফলে সে দেশের একটি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটল। আন্দোলন কালে ১৯ জন (পরে জানা গেছে ৫১ জন) মানুষের প্রাণহাণি ঘটে এবং যা সম্পদ নষ্ট হয়েছে তা দেশটির অন্তত দেড় বছরের বাজেটের সমান। বলা হচ্ছে, আন্দোলন এতটাই উগ্র, বেপরোয়া এবং আক্রমণমুখী ছিল যে প্রধানমন্ত্রী ওলি পদত্যাগ না করলে আরও অনেক বেশি জীবনহানি ঘটত, আরও অনেক বেশি রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হত।

জঙ্গি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে যা বলা হচ্ছে তা হল সরকার -

১) ব্যক্তি মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করেছে।

২) গণ মাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে।

৩) সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে।

যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকারের বিরুদ্ধে এইসব গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে সেটি হল এই যে, ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে নেপালের যোগাযোগ মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুং তাঁর দেশে ফেসবুক, ইউ-টিউব, মেটা এবং আরও কিছু বড় ও প্রভাবশালী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেন।

আজকের দিনে ব্যবসা-বানিজ্য এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভুমিকা পালন করে। এছাড়াও আছে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বিনোদনের বিষয়টিও। মনে রাখতে হবে, নেপালের মোট জনসংখ্যা ৩ কোটির মত। তার মধ্যে ফেসবুক ব্যবহার করেন ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষ। ফেসবুকের মত জনপ্রিয় মাধ্যম বন্ধ করলে তাৎক্ষণিক ভাবে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা নিশ্চয় ওলি সরকার জানতেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যে দুর্মর প্রতি-আক্রমণে পর্যবসিত হবে তা ওঁরা বোঝেন নি! আসলে ওঁরা ওঁদের ছোটবেলাটা ভুলে গেছেন। সে সময়ে আপাততুচ্ছ খেলানাটা কেউ কেড়ে নিলে তাঁরা চেঁচিয়ে সারা বাড়ি মাত করে দিতেন। আজ সেই তাঁরাই যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ফেসবুক বন্ধ করার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছেন!

নেপালের রাজনীতি গণতান্ত্রিক পরিবেশে পা দিয়েছে ২০০৮ সালে। তার পর থেকে এ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়ে ক্ষমতায় থেকেছে তিনটি দল-

১) নেপালি কংগ্রেস

২) ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ নেপাল (মাওবাদী)

৩) কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ নেপাল (ইউনিফায়েড এম-এল)

ঘুরে-ফিরে এবং যোগে বিয়োগে শেষ বার ক্ষমতায় ছিলেন এই শেষোক্ত দলটির প্রধান খড়্গ প্রসাদ ওলি। গদিতে বসেন মাত্রই গত বছরের ১৪ জুলাই তারিখে। তাঁর আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাওবাদী আন্দোলনের অধিপতি পুষ্প কুমার দাহাল যিনি আমাদের কাছে প্রচন্ড নামে পরিচিত। তাঁর সময়কালেই, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে চালু হয় 'NEW SOCIAL MEDIA REGULATION'. এই রেগুলেশন অনুযায়ী সকল সামাজিক মাধ্যমগুলির প্রতি এই নির্দেশ জারি করা হয় যে -

১) সবাইকে একটি স্থানীয় (এক্ষেত্রে নেপালে) যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

২) অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৩) ফৌজদারি অভিযোগের তদন্তে সহযোগীতা করতে হবে।

৪) তাদের কাজকর্ম 'নেপালি আইন' এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে

৫) বেআইনি কনটেন্ট মুছে দিতে হবে।

সরকার এই নির্দেশের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিল তা হল তারা

১) ফেক একাউন্টগুলি সনাক্ত করতে চায়।

২) হেট স্পিচ বন্ধ করতে চায়।

৩) অপতথ্যের প্রচারে লাগাম টানতে চায়।

৪) সাইবার ক্রাইম বন্ধ করতে চায়।

এসব নিয়ে বাক-বিতন্ডা চলতে থাকে। আইনি জটিলতাও উপস্থিত হয়।

এরপর বতর্মান সরকার এই বছরের জানুয়ারী মাসে 'SOCIAL MEDIA BILL' গ্রহণ করে এবং শেষমেষ এবছরের আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে ২৬ টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে এই দেশে অর্থাৎ নেপালে 'রেজিস্ট্রিকৃত' করার নির্দেশ দেয় এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য এক সপ্তাহ সময় বরাদ্দ করে। টিক-টকের মত জনপ্রিয় মাধ্যম এবং আরও কয়েকটি মাধ্যম সরকারের এই নির্দেশ মানলেও ফেসবুক, ইউ-টিউব, মেটা এবং আরও কয়েকটি মাধ্যম এই নির্দেশে কর্ণপাত করেনি। এরপর ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে সরকার অবাধ্য সামাজিক মাধ্যমগুলিকে বন্ধ করে দেয়।

৮ তারিখ সকাল থেকেই শুরু হয় মারমুখি আন্দোলন। পার্লামেন্ট অভিযানের নামে শুরু হয় আগ্রাসন, পুলিশ বাধ্য হয় গুলি ছুঁড়তে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সব বড় শহরে। তার পরেই চলে আগুন খেলা। কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্ট ভবন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিস, নামী প্রাইভেট হোটেল, ব্যবসাকেন্দ্র, নেতা-মন্ত্রীদের বাসভবন, তাঁদের পরিবার-পরিজন কেউ বাদ যায় নি অগ্নি সংযোগ এবং মৃত্যুর ক্রুরতা থেকে। শুধু কাঠমন্ডু নয়, জেলাগুলিতেও অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এই আগুনে আন্দোলন। প্রথম দিনেই পদত্যাগ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু তাতেও রক্ষা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী অলি পদত্যাগ করার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়। অল্প টানাপোড়েনের পর আন্দোলনকারীদের পছন্দের মানুষ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীমতী সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। এর পরেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেন।

অনেকেই বলছেন, শ্রীমতী কার্কির এই ক্ষমতা গ্রহণ সংবিধান সম্মত হয় নি। নেপালের সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কোন সুযোগ নেই। যে সরকারই আসুক না কেন তাকে পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন থাকতে হবে। নেপালের প্রধান তিনটি দল সহ আটটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ভেঙে দেওয়া পার্লামেন্টের স্পীকার সামগ্রিক ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। দলগুলির বক্তব্য, পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকে আলোচনা হতে পারত, সেখান থেকে নতুন সরকার গঠিত হতে পারত।

তবে সরকার বিরোধী এই আন্দোলন ও পট পরিবর্তন স্বতস্ফুর্ত বলে যে দাবি করা হচ্ছে তার কোন ভিত্তি নেই। এই আন্দোলন অবশ্যই একটি পরিকল্পিত রূপরেখার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এবং ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ৮ সেপ্টেম্বর তারিখের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সামাজিক মাধ্যমে একটা দিক নির্দেশকারী প্রচার শুরু করা হয়েছিল। 'হ্যাশট্যাগ নেপো বেবিজ' #NEPO BABIES) এবং 'হ্যাশট্যাগ নেপো কিডস্' S#NEPO KIDSV এ রাজনৈতিক নেতাদের ছেলেমেয়েদের বিলাসী এবং বৈভবী জীবন যাত্রার ছবি, সেই সংক্রান্ত লেখা এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে ছাত্র-যুবক-জনতাকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল রাজনৈতিক ব্যক্তি, দল ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। সরকারের স্বজনপোষন, অপদার্থতা, বেকারী, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, মনুষ্যজীবনের ক্ষয় ও অবমূল্যায়ন এবং তজ্জনিত হতাশা- ক্ষোভ-ক্রোধ তো পটভূমি হিসাবে যে কোন আন্দোলনকেই সমৃদ্ধ করে। নেপালের এই নতুন ধারার আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়।

বিশেষ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নাকি নাগরিকত্ব হরণ ?

সুকুমার মিত্র

সার চর্চা

গত ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে নির্বাচন কমিশন বিহার থেকে শুরু করে সমগ্র দেশে SIR বা 'সার' (Special Revision of Electoral Rolls) প্রক্রিয়া চালু করে। এটি ভোটার তালিকার ২১তম বিশেষ পরিমার্জন, কিন্তু শেষ সংশোধনের পর এটিই সবচেয়ে দীর্ঘ ব্যবধানে (২০ বছর পর) হতে চলেছে। এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে দেশে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, যা ভোটার তালিকা সংশোধনের গণ্ডি পেরিয়ে নাগরিকত্বের প্রশ্নে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচটি মুখ্য পক্ষ ও তাদের অবস্থান

১. কেন্দ্রীয় সরকার সরকারের দাবি, এটি নির্বাচন কমিশনের একটি রুটিন কাজ। সংবিধান স্বীকৃত এই স্বশাসিত সংস্থার কাজে সরকারের কোন হস্তক্ষেপ নেই।

২. বিরোধী দলগুলি তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন আরএসএস-বিজেপির এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে। বিরোধী দলগুলির সমর্থক ভোটারদের ইচ্ছাকৃতভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতাদখলের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা চলছে।

৩. ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) দাবি করে, তারা সংবিধান ও আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাই প্রয়োগ করছে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা বাদ প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব যাচাই করা তাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। তারা সুপ্রিম কোর্টে এই অবস্থান পেশ করেছে।

৪. সুপ্রিম কোর্ট সমালোচকদের মতে, সুপ্রিম কোর্ট একটি

'ফ্লিপ-ফ্লপ' সংস্থায় পরিণত হয়েছে, যা প্রায়শই পরস্পরবিরোধী রায় দেয়। আধারকে ভোটার নথি হিসেবে সীমিত স্বীকৃতি দিলেও, এটি যে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি, সেকথা মাথায় রেখে সরকার বা ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI)-র উপর নজরদারির ভূমিকা নেয়নি।

৫. স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন SIR বিরোধী আন্দোলনকারী শক্তি এই পক্ষটি SIR প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার সরাসরি ষড়যন্ত্র দেখছে। তাদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভোটব্যাংক নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু এই পক্ষটি নাগরিকত্ব রক্ষায় আন্তরিক।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার অস্ত্রভাণ্ডার

ভারতের নির্বাচন কমিশন বা ECI-র হাতে সংবিধান ও আইন দ্বারা প্রদত্ত অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু ক্ষমতা রয়েছে, যা 'সার' প্রক্রিয়াকে চালিত করছে।

• সংবিধানের ধারা ৩২৪-৩২৯ এই ধারাগুলি ভারতের নির্বাচন কমিশন বা ECI-কে জাতীয় ও রাজ্য নির্বাচনের 'অধীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার' (Superintendence– control and direction) পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে। ধারা ৩২৯ এ আদালতের হস্তক্ষেপও সীমিত করা হয়েছে।

• জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২১(৩) এই ধারা ভারতের নির্বাচন কমিশন বা ECI-কে যেকোনো নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটার তালিকার 'বিশেষ পরিমার্জন' (Special Revision) করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

• নির্বাচক নিবন্ধন বিধি, ১৯৬০-এর ধারা ২৫ ECI ভোটার তালিকা 'নিবিড়ভাবে' (Intensively) বা 'তাৎক্ষণিকভাবে' (Summarily) সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

• বিহারের নির্দেশিকা ধারা ৫(খ) নির্বাচন আধিকারিক (ECI) কোনো ভোটারকে বিদেশি বলে সন্দেহ করলে, তার বিষয়টি নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে প্রেরণ করতে পারেন।

• নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২৩ এই নতুন আইনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ কমিটিতে সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করা হয়েছে, যা ভারতের নির্বাচন কমিশনের বা ECI-র স্বাধীনতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলছে ।

ভোটার হওয়ার মাপকাঠি একটি বাস্তবতা পরীক্ষা

SIR-এর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন যে নথিগুলি চেয়েছে, সেগুলি ভারতের সাধারণ ও দরিদ্র জনগণের জন্য অত্যন্ত দুরূহ।

• পেনশন অর্ডার (PPO) ভারতে মাত্র 12% কর্মরত মানুষ পেনশনের আওতায় আছেন।

• জন্ম সার্টিফিকেট (Birth Certificate) ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী, 15.1% জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশ নিবন্ধিত নেই। বিহারে ২০০১-০৫ সালে জন্মানোদের মাত্র 2.8% এর B.C. আছে।

• পাসপোর্ট দেশের মাত্র ***7.2%*** মানুষের পাসপোর্ট রয়েছে।

• শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র কর্মরত জনসংখ্যার 30% মাধ্যমিক স্কুলে যায়নি, তাই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট নেই।

• SC/ST/OBC সার্টিফিকেট ২০১১-১২ সালের তথ্য অনুসারে, 50% SC/ST এবং 62% OBC-র Caste Certificate বা জাতগত শংসাপত্র নেই।

• আধার ডিসেম্বর ২০১৯-এ আধার কভারেজ 89.6% হলেও উত্তর-পূর্ব রাজ্য যেমন অসম, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড-এ এটি যথাক্রমে মাত্র 17.6% – 29.3% ও 57%।

• নাগরিকত্বপঞ্জিকরন সার্টিফিকেট বা NRC Certificate অসম-এর বাইরে কারও NRC সার্টিফিকেট নেই।

বিহার SIR সুপ্রিম কোর্টের করা অবস্থান, চূড়ান্ত শুনানি ৭ অক্টোবর

বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) তে নির্বাচন কমিশন অবৈধ পদ্ধতি ব্যবহার করলে পুরো প্রক্রিয়া বাতিল হবে বলে সুপ্রিম কোর্টের রায়।

বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) কার্যক্রমের বৈধতা চূড়ান্ত শুনানির জন্য আদালত ৭ অক্টোবর তারিখ নির্ধারণ করেছে।

১৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, বিহারে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিতে কোনো অবৈধতা পাওয়া গেলে, এই পুরো কার্যক্রম বাতিল করা হবে।

শীর্ষ আদালত জানায়, 'আমরা ধরে নিচ্ছি যে নির্বাচন কমিশন, একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ, বিহারের SIR প্রক্রিয়ায় আইন ও বাধ্যতামূলক নিয়ম মেনে চলছে। 'এছাড়াও আদালত বলে যে, এটি বিহারের বিষয়ে খণ্ডিত মতামত দিতে পারবে না এবং চূড়ান্ত রায় সমগ্র ভারতের SIR-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আদালত বিহারে SIR কার্যক্রমের বৈধতা সংক্রান্ত চূড়ান্ত শুনানির জন্য ৭ অক্টোবর তারিখ নির্ধারণ করেছে।

'বিহার SIR-এর উপর আমাদের রায় সমগ্র ভারতের SIR-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে,' ; আদালত এমনটি জানানোর পাশাপাশি স্পষ্ট করে যে, এটি দেশজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য একই ধরনের কার্যক্রম চালানো থেকে নির্বাচন কমিশনকে বিরত রাখতে পারবে না।

এদিকে, ৮ সেপ্টেম্বরের শীর্ষ আদালতের সেই আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি আবেদনের ভিত্তিতে নোটিস জারি করেছে,

যেখানে বিহার SIR-তে ১২তম নথি হিসেবে আধার কার্ড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৮ সেপ্টেম্বর, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে যে আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় এবং একজন ভোটার কর্তৃক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য জমা দেওয়া হলে নির্বাচন কমিশন এর সত্যতা যাচাই করতে পারবে।

উপসংহার

Special Intensive Revision বা SIR প্রক্রিয়াটি Booth Level Officer SBLOV-নির্ভর। Enumeration Form বা ভোটার তালিকায় নাম তোলার ফর্ম শুধুমাত্র BLO-দের কাছেই থাকে। বিহারের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ১.১৫ মানুষের ইন্টারনেট-সুবিধাযুক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করার ক্ষমতা আছে, ফলে মানুষ BLO-দের ইচ্ছা ও দয়ার উপর নির্ভরশীল।

মোদ্দা কথা, (জ্জট্ট কেবল ভোটার তালিকা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া নয়। যে নথিগুলি চাওয়া হচ্ছে, তা দেশের একটি বৃহৎ অংশের (বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক, অশিক্ষিত, নিরক্ষর জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের) মানুষের পক্ষে জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। ফলে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বৈধ ভারতীয় নাগরিক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার এবং বস্তুত 'নাগরিকত্বহীন' হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এটি সংবিধান প্রদত্ত সর্বজনীন ভোটাধিকারের মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি গভীর সংকটের ইঙ্গিতবাহী বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

অনুপর্ণা রায় : ভেনিসেও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি পুরুলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের খেতাব জয় করেছেন অনুপর্ণা রায়ের। পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা তাঁর 'সংস অফ ফরগট্ন ট্রিজ' ছবির জন্য পুরস্কৃত পরিচালক। ভারতকে গর্বিত করেছেন অনুপর্ণা। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শেষদিনের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় পুরস্কার। অনুপর্ণার হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকুরনো। এটি প্রথম ভারতীয় সিনেমা, যা 'অরিজন্টি' বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জয় করেছেন। 'সংস অফ ফরগট্ন ট্রিজ' সিনেমার জন্য পুরস্কৃত অনুপর্ণা। সিনেমাটি কয়েকজন নারীর জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ছবিতে তাঁদের জীবনের একাকিত্ব এবং সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রান টু দ্য রিভার' এবং ২০২৫-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'সংস অফ ফরগট্ন ট্রিজ'-এর জন্য অনুপর্ণা এখন সুপরিচিত। অনুপর্ণার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমাটিই ভেনিসে পুরস্কৃত হল। অনুপর্ণার এই জয় ভারতের জন্য অত্যন্ত গর্বের বলা চলে।

প্রযোজক অনুরাগ কাশ্যপ-সহ সমস্ত কলাকুশলীদের এ দিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনুপর্ণা। পুরস্কার জয়ের পরে সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে শুভেচ্ছাবার্তায়। ছবিতে অভিনয় করেছেন নাজ শেখ, সুমি বাঘেলের মতো অভিনেতারা।

পুরস্কার হাতে পাওয়ার পরে তাঁর ভাষণে অনুপর্ণা প্যালেস্টাইনের অনাহারক্লিষ্ট শিশুদের কথা বলেছেন। এক সাক্ষাৎকারে অনুপর্ণা জানান, অনেকের ধারণা, প্যালেস্তাইনে ঘটে চলা নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই আমাদের দেশের শাসকদলের বিরোধিতা করা। কিন্তু আমি তো কেবল হাজার হাজার শিশু এবং নির্দোষদের নৃশংস ভাবে হত্যা করার বিরোধিতা করেছি। নিজের দেশের কোনও রাজনৈতিক দলকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। শাসকদলের সদস্যেরাও আমাকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমার আশপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের মানসিকতায় এই হিংস্রতা প্রকাশ পায়। আমি কেবল সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি এরপর বাংলা ছবি করার কথা ভাববেন কিনা। অনুপর্ণা জানান, যদি সুযোগ পাই, তা হলে কলকাতা শহরটাকে আগে চিনতে চাই। তার পর ছবিও বানাতে চাই। অবশ্য আমি পুরুলিয়ার ভাষাতেই ছবি বানাতে চাই। আমার বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়।

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা পরিচালকের পুরস্কার হাতে তুলে নিয়েছেন অনুপর্ণা। সেই মেয়ের ছবি তৈরির হাতে-খড়ি কিন্তু বাংলার প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়াতেই। 'সংস অফ ফরগট্ন ট্রিজ' ছবির পরিচালক অনুপর্ণা রায়ের জন্ম পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামে। তাঁর শিকড় যে জঙ্গলমহলের গভীরে গেঁথে রয়েছে, তার ঝলক দেখা গিয়েছে তাঁর কাজেই।

ভেনিসে সাদা শাড়িতে মঞ্চে উঠেছিলেন অনুপর্ণা। অনুপর্ণা বলেন, খুব ভারী শাড়ি পরার অভ্যাস নেই একেবারে। কিন্তু শাড়ি তো পরতেই হত। বাঙালি বলে কথা। তাই সুতি আর সিল্ক মেশানো এই শাড়িটি পরেছিলাম। এই শাড়ির সঙ্গে একটা গল্পও আছে। আমার এক বন্ধু আছেন মুস্কান মিত্তাল, অসমে থাকেন, পোশাকশিল্পী। তাঁকেই বলেছিলাম একটা শাড়ি বানিয়ে দিতে, যেটার উপরে পুরুলিয়ার দেওয়ালচিত্র আঁকা থাকবে। তো এ ভাবেই শাড়িটা বানানো হয়। পুরস্কার গ্রহণের পরে তাঁর ভাষণে অনুপর্ণা বলেন, 'আমার কাছে এটা একেবারে স্বপ্নের মতো। প্রত্যেক নারীর লড়াইয়ের গল্প হয়ে উঠবে এই সিনেমা। যাঁরা নিঃশব্দে লড়াইয়ের পরেও তেমন গুরুত্ব পান না, তাঁদেরকে উৎসর্গ করা হলো এই ছবি। এই জয় নীরব বিপ্লবীদের ভাষা হয়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

পুরস্কার পাওয়ার পরে চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি যেন ফিলিস্তিন নিয়ে কোন কথা না বলি, এমনই চেয়েছিলেন আমার ছবির প্রযোজকেরা। এমন কি অনুরাগ কাশ্যপও অনুপর্ণাকে এ নিয়ে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথা শোনেননননি, শুনেছেন নিজের মনের কথা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভেনিসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি যা বলেছিলাম তা আমারই কথা এবং তা আমি বলব বলেই বলেছি। বিশ্বজুড়ে যে অন্যায় চলছে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এটা বলা হয়েছিল। যদি আমি ফিলিস্তিনকে সমর্থন করি, যদি আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাহলে ভারতীত্ব কমে যায় না। অনেকে ভাবছেন আমি এই প্রথম ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বললাম, না তা নয়। রাশিয়ায় একটা পুরস্কার নেওয়ার সময়েও আমি ফিলিস্তিনের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এর অর্থ এই নয় যে আমি বিশ্বের অন্য কোন গণহত্যা বা নেপালের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে কথা বলব না।'

পুরুলিয়ার দুবেশ্বরীতে ইসিএলের কোলিয়ারিতে কাজ করতেন অনুপর্ণার বাবা ব্রহ্মানন্দ রায়। নারায়ণপুর ও স্থানীয় রানিপুর হাই স্কুলে পড়াশোনা করে অনুপর্ণা। উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনা মামাবাড়িতে, পুরুলিয়ারই পুঞ্চার ন'পাড়া হাইস্কুলে। প্রোমোশন পেয়ে পশ্চিম বর্ধমানের মিঠানি কোলিয়ারিতে বদলি হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ পরিবার নিয়ে কুলটিতে চলে যান। মাম্পি (অনুপর্ণার ডাকনাম) ছোটবেলা থেকেই বাড়ির খুবই আদুরে ছিল। তাঁর মামা নীলোৎপল সিংহের সূত্রেই এই সব কথা জানা গেছে।

কুলটিতে একটি আবাসনে স্ত্রী মনীষাকে নিয়ে থাকেন অনুপর্ণার বাবা ব্রহ্মানন্দ। বদলি হয়ে আসার পরে প্রথমে কুলটিতে ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। সেখানেই মেয়েকে কুলটি কলেজে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি করেন। তাঁর ছোট মেয়ে সুপর্ণা এমবিএ করে কলকাতায় চাকরি করেন। অনুপর্ণার মা জানিয়েছেন, 'ছোটবেলা থেকেই খুব গল্প শুনতে ভালোবাসত মাম্পি।'

ওঁর বাবা বলেন, 'যা শুনত খাতায় লিখে রাখত। বাংলা পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে ওর জন্ম হয়েছিল।'

উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময়ে ঘটা একটি ঘটনা মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে মামা নীলোৎপলবাবুর। বলছিলেন, 'স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাকে একদিন ফোন করে জানালেন, মাম্পি একটি ছেলেকে সপাটে চড় কষিয়েছে। কেন এমন গন্ডগোল করল জানতে ছুটে স্কুলে গেলাম। কারণ জানতে চাইলে ও বলল, সেই ছেলেটি এক ছাত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছিল। মনে হয়েছিল এই আচরণের প্রতিবাদ করা দরকার। আর কিছু বলিনি।'

কুলটি কলেজে পড়া শেষ করে অনুপর্ণা দিল্লিতে চলে যায় মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়তে। সেখানে একবার ওঁর পক্স হয়েছিল। সে সময়ে কেউ ওখানে নেই। একাই ওকে লড়তে হয়েছিল রোগের সঙ্গে। অনুপর্ণা তাঁর প্রথম শর্ট ফিল্ম 'রান টু দ্য রিভার' তৈরির জন্য বেছে নিয়েছিলেন পুরুলিয়ার ল্যান্ডস্কেপকেই। তাঁর কৈশোরের ন'পাড়া ও সংলগ্ন এলাকাই ছিল তাঁর আউটডোর লোকেশন। ন'পাড়া, লাগোয়া কাপাসগোড়া, পাশের কাশীপুর সমেত এই এলাকাতেই হয়েছিল শুটিং। ছবির চরিত্ররাও ন'পাড়া গ্রামেরই। সেখানকার বাসিন্দা দিগম্বর মাহাতো, রঞ্জিত মাহাতো ওই ছবিতে দু'টি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অনুপর্ণা কিন্তু ভেনিসে তাঁর বক্তৃতায় নিজের মাতৃভূমিকে স্মরণ করতে ভোলেননি।

সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিতে চলেছে

সৌর বসু

বিগত অগস্ট মাসে আলাস্কাতে পুতিন এবং ট্রাম্পের বৈঠকের পর বিশ্ব রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আলাস্কার বৈঠকের শেষে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এই বৈঠককে আশাপ্রদ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যদিও বৈঠক সম্বন্ধে বিশদ কিছু তারা বলতে রাজি হননি। তারা জানিয়েছিলেন যে কিছু বিষয় অমীমাংসিত থেকে গেছে, তবে ভরসা রাখছেন সেগুলোর সত্বর মীমাংসা হয়ে যাবে।

আলাস্কার বৈঠকের পরেই ৩০ আগষ্ট ,২০২৫ এ অনুষ্ঠিত হয় চীনের তিয়ানজিঙে, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনে যোগ দিতে ৭ বছর পর ভারত চিনদেশে যায়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন শুল্ক কে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, ভারতসহ অন্যান্য দেশগুলিকে হুমকি প্রদর্শন করছে, তিয়ানজিন শহরে, তখন, এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিঃসন্দেহে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম।।

দুদিনের এই সম্মেলনে গ্লোবাল সাউথের কুড়িজনের অধিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গ্লোবাল সাউথ অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি এবং ইইসির (European Economic Community) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো বাদে, মোটামুটি ভাবে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ,এশিয়া ওসানিয়ার উন্নয়ন দেশগুলি। দুদিনের এই সম্মেলনে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থিক অবস্থা এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ববস্থার এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের আধিপত্যবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। সম্মেলনে চীনের রাষ্ট্রপতি সি জিনপিং তার উদ্বোধনী ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির ফলে বিশ্বজুড়ে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে এবং যেভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে

তার ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। শি জিনপিং তাঁর ভাষণে বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলা দূর করে, সমগ্র বিশ্বে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

দুদিনের এই বৈঠকে পুতিন এবং নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত ছিলেন । ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাত বছর পর চীনে এলেন বৈঠকে যোগদান করতে। এটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে পুতিন শি জিন পিং এবং মোদীকে দেখা গেছে পারস্পরিক আলোচনা করতে। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে চীন এবং ভারতের সম্পর্কে উন্নতি ঘটতে পারে। ভূ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে এই বৈঠক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মোড় ঘোরানোর একটি ইঙ্গিত বহন করছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Dr Jeffrey Sach মনে করেন ১৯৪৫ সালের পর থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা দেশগুলি , গ্রেট ব্রিটেন , সোভিয়েত ইউনিয়ন -প্রযুক্তি, অর্থনীতি , ফিনান্সিয়াল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করে এসেছে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার দেশগুলি এবং এশিয়ার চীন ভারত সহ অন্যান্য দেশগুলির তখন কোনও বিশেষ ভূমিকা ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়১৯৯১ সাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠে পরম শক্তিধর দেশ ।প্রতিষ্ঠিত হয় এক মেরু বিশিষ্ট বিশ্ব ব্যবস্থা (Unipolar world)। শুধু ক্ষমতার বিন্যাসে নয়, ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার জনসংখ্যা থেকে বেশি।

এতদিন অবধি বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার বিন্যাস ছিল ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন হতে শুরু করে। কি সেই পরিবর্তন। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ১৯৮০ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সম্মিলিত অর্থনীতি চীন দেশের থেকে দশগুণ বৃহৎ ছিল। আজকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ গুলি এবং চীন দেশের অর্থনীতি একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি কিশোর মোহব্বানি তার একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে ২০৫০ সালে চীনের অর্থনীতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বিশ্বের অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তন এর ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে তিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। গ্রেট ব্রিটেন প্রসঙ্গে তিনি বলেন আজ থেকে ১০০ বছর আগে একশ হাজার বা ১ লক্ষ ইংরেজ, তিন কোটি জনসংখ্যার ভারতের উপর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। ৩৫ বছর আগেও বৃটেনের জিডিপি ছিল ভারতের চার গুণ। আর আজ ২০২৫ সালে ভারতের অর্থনীতি বৃটেনের অর্থনীতিকে ছাপিয়ে গেছে । ভারত আজ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। ১৯৬৭ সালে গঠিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাতি সংস্থা বা আসিয়ান। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ভিয়েতনাম লাওস প্রভৃতি দেশগুলি যার সভ্য। জার্মানি ইউরোপের অন্যতম শিল্প উন্নত দেশ, যার অর্থনীতি , ২০০০ সালে আসিয়ান জাতিসংস্থার থেকে তিনগুণ বৃহৎ ছিল। সম্প্রতি আসিয়ান জাতিসংস্থার অর্থনীতি জার্মানির অর্থনীতিকে ছুঁয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যতে আরো কুড়ি পঁচিশ বছর পরে আসিয়ানের অর্থনীতি জার্মানির দ্বিগুণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদাহরণগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল চলছে। এখন এই পালাবদল পর্বে, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি ,যারা এতদিন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে , তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মেনে নেবার সময় হয়েছে। কিন্তু তারা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে নানা ভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে । উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে । আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা । বিভিন্ন দেশের পরিকাঠামো গঠনে এই সংস্থা বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে । ভোটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে ভোট প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় ইকোনমিক কমিউনিটির জিডিপি বিশ্বের জিডিপির ১৭শতাংশ । চীনের জিডিপিও সমগ্র বিশ্বের জিডিপির ১৭ শতাংশ। কিন্তু ভোট প্রদানের ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি । আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডরের ভোট প্রদানের কাঠামো অনুযায়ী ইউরোপের অংশীদারিত্ব ২৬ শতাংশ। কিন্তু চীনের অংশীদারিত্ব মাত্র ছয় শতাংশ। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ইউরোপের দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংস্কারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রেও সংস্কারের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯৪৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , গ্রেট ব্রিটেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ,ফ্রান্স এবং চীন ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র। আজও ২০২৫ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ অর্থনীতি। , ফ্রান্সের অর্থনীতিও দুর্বল এবং বিগত দু বছরে চারবার ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্বেও আজও তারা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ।

অন্যদিকে BRICKS ব্লকটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার - শতাংশ অংশীদারিত্ব ব্রিকস এর সভ্য দেশগুলির। জিডিপির ক্ষেত্রেও ব্রিক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির অংশ দারিত্ব ৩৫ শতাংশ এবং পৃথিবীর মোট তেল উৎপাদনের ৩০ শতাংশ তেল ব্রিকস ব্লকের দেশগুলি উৎপাদন করে। ব্রিকস ব্লকের সদস্য সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ইরান , ইজিপট ,ইথিওপিয়া, এবং ইউ এ ই বিগত সম্মেলনে ব্রিকসের সদস্য ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া ব্রিকসের দশম সদস্য হিসেবে যোগদান করেছে। এছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য বিভিন্ন দেশ ব্রিকসের সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করে ১৯৯০ এর দশক থেকে। ক্রমে তা বৃদ্ধি পায়। ইউ পি এ সরকারের আমলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে ওঠে। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় দফায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারত ,ডোনাল্ড ট্রাম্পের রোষের শিকার হয়। আমেরিকা, ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপানোর পর নরেন্দ্র মোদী সম্বিত ফিরে পায়। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে।

বাধ্য হয়ে ভারত তিয়ানজিঙে সাংহাই কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন এর বৈঠকে যোগ দিতে চিনে যান। পুতিনের মধ্যস্থতায় চিনের সঙ্গে ভারতের আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়। ভারত এবং চিন আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে তার মঙ্গলজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আধিপত্যবাদী নীতি তার বিরুদ্ধে উদীয়মান অর্থনীতির গোষ্ঠীগুলি বিকল্প একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

হংকংয়ে একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ অধ্যাপক Kishore Mahbubani বলেছেন ,' A world order dominated by the West for centuries is now facing a fundamental and irreversible challenge.।

অথ রোহিঙ্গা উপাখ্যান

ডা. অমিত পান

বিখ্যাত সব দুর্গাপূজায় এখন যেমন কোনো 'থিম' ছাড়া চলে না, তেমনি ভোটের আগে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোরও এক একটা 'থিম'এর প্রয়োজন ঘটে। মানে, এটাই হবে আগামী নির্বাচনে ঐ দলের প্রচারের সবিশেষ নির্বন্ধ; বাকি বক্তব্যগুলো উঠে আসবে এইটাকে কেন্দ্র করে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচনের এখন অনেক দেরি থাকলেও, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোর ভোট সামনে। তাই, আগামী দিনে কেন্দ্রে শাসক দলের 'থিম' সাবজেক্ট হলো 'Illegal immigration with special emphasis on Rohingyas'। অবশ্য এই immigration এ কোনটা legal আরকোনটা illegal তাসবই ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সরকার বা বলা ভালো শাসকদল। মাঝে মাঝেই নানা রকম আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়, সর্বশেষ হলো Immigration and foreigners law modification ২০২৫ ; আর এই সংক্রান্ত একটি notificationও বিজ্ঞাপিত হয়েছে অতি সম্প্রতি। সেখানে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম থাকলেও একটি বিশেষ সম্প্রদায় কি যেন বলে, conspicuously absent– আর দুর্ভাগ্যবশতঃ রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। যদিও কিছু রোহিঙ্গা আছে যারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত, তাতে করে তাদের ভাগ্য অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু, এরা তো সকলেই ধর্মীয় ও সামাজিক উৎপীড়নের শিকার, মায়ানমারের সংখ্যাগুরু বুদ্ধিস্ট ও সামরিক বাহিনীর যৌথ আক্রমণের। তাহলে, ঠিক কী কী কারণে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে গণ্য করা দূরে থাকুক, রীতিমতো ভিলেন হিসেবেই চিহ্নিত করা হচ্ছে?

UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) এর মতে, সারা পৃথিবীতে বলপূর্বক অপসারিত (forcefully displaced) মানুষের সংখ্যা ১২ কোটির কিছু বেশি আর রাষ্ট্রহীন মানুষের (Stateless People) সংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষের মতো। রোহিঙ্গাদের দুর্ভাগ্য তারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই পড়ে। ১৯৪৮ সালে বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) স্বাধীন হওয়ার পরে অবস্থা সেভাবে খারাপ ছিল না এবং রোহিঙ্গারা আইনসভাতেও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর থেকে। আর, ১৯৮২ সালে নতুন নাগরিক আইনে দেশের ১৩৫টি জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিলেও বাদ থাকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়, অর্থাৎ তারা নাগরিক হওয়ার সমস্ত সুবিধা থেকেই রয়ে যায় বঞ্চিত। উচ্চ শিক্ষা, চাকরি, জমি ক্রয় বিক্রয় সবেতেই ঘোরতর সমস্যা। ২০১৪ সালে জনগণনায় তাদের অংশগ্রহণই করতে দেওয়া হয়নি, রাখিন প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিস্টদের (প্রদেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ) আপত্তিতে। বলা হয়, তাদের পরিচয় দিতে হবে 'বাঙালি' হিসেবে। মুশকিল হলো ঐ ১৩৫টি স্বীকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু 'বাঙালি'ও পড়ে না, বাঙালি হিন্দুরাও নয়। তবে, ঐ রাখিন প্রদেশেরই 'কামেন' নামে হাজার ত্রিশ মানুষের একটি ছোট মুসলিম গোষ্ঠী, সংখ্যায় সারা দেশে বোধহয় পঞ্চাশ হাজারের বেশি হবে না, তারা কিন্তু স্বীকৃত! আসলে, ধর্মীয় বিভেদ থাকলেও ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের পার্থক্য বিশেষ নেই। অনুমোদন বা স্বীকৃতি সম্ভবতঃ সেই কারণেই! তাছাড়া, এতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অভিযোগটাও হয়তো কিছুটা লঘু করা যায়!

এক সময় বার্মা মুলুকে দলে দলে মানুষ গেছে চাকরি, রোজগার ও ব্যবসার তাগিদে বিশেষ করে বিংশ শতাধীর প্রথম থেকে অন্ততঃ তিন দশক প্রতি বছর প্রায় দু আড়াই লাখ লোক যেতো বার্মায় মূল ভারত ভূখণ্ড থেকে যাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বাঙালি। কিন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই (১৯৩৮) ব্যাপক ভাবে শুরু হয় 'ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙালি বিতারণ', হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ; একটা বড় অজুহাত ছিল বুদ্ধের প্রতি অবমাননাকর এক পুস্তক। সেই একই গল্প, ধর্মের নামটা একটু এধার ওধার !

সহমর্মিতা (compassion) ও ক্ষমার প্রতিমূর্তির উপাসকরাও যে ক্ষেত্রবিশেষে কী রূপ ধারণ করতে পারে তা বার্মা মুলুক থেকে চলে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষদের কাছে গেলেই জানতে পারা সম্ভব।

মায়ানমার (১৯৮৯ সালে নাম পরিবর্তিত বার্মা থেকে) সরকার ও সংখ্যাগুরু বুদ্ধিস্টদের বক্তব্য এই রোহিঙ্গারাও বাঙালি,তাই তাদেরসেখানেথাকারকোনো অধিকারবা বৈধতা নেই।

তাহলে, মায়ানমারের তৎকালীন পনেরো লক্ষ রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় কী? সেটাই হলো, সবচেয়ে বড় সমস্যা।

প্রশ্ন দুটি, এক রোহিঙ্গারা কি সত্যিই বাঙালি, আর দুই বাঙালি হলেইতারকোনো দেশেথাকার অধিকারথাকবেনা কেন?

সরকার ও বুদ্ধিস্টদের বক্তব্য, ব্রিটিশ এদের পূর্ব বাংলা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছে চাষবাসের জন্য। এটা ঘটনা ব্রিটিশ রাজত্বে বিরাট জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো তাদের আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে। মরিশাস, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরাট সংখ্যক মানুষ গেছে এদেশ থেকে। সাঁওতাল পরগণা ও বিহারের বহু শ্রমিক গেছে উত্তর বঙ্গ ও আসামের চা বাগিচায়। তাতে সেই মানুষগুলোর অপরাধটা কোথায়?

আসামে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় চাষের জন্য বাংলাদেশেব চাষীদের বসিয়েছিল ব্রিটিশ নিজেদের 'রেভেন্যু' বাড়ানোর জন্য, যাদের বেশিরভাগই ছিল মুসলিম। স্বাধীন তারপর জমিতে অধিকার পাওয়ার ইচ্ছায় তারাই নিজেদের পরিচয়দেয় 'অসমীয়া ভাষা ব্যবহারকারী' হিসেবে (Na Assmiya বা নয়া অসমীয়া)। তৎকালীন অসম সমাজ কিন্তু তাদের সাগ্রহে গ্রহণ করে, নাহলে বাংলাভাষীর সংখ্যা তাদের ছাপিয়ে যেতো। সে উপাখ্যান সম্ভবতঃ বর্তমান শাসকরা আরাম করে বিস্মৃত হয়েছে।

যাক, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু, রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে সেটাই পুরোপুরি ঘটনা নয়, আংশিক মাত্র। আসলে, আলাদা দেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার আগে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের মধ্যে মানুষের যাতায়াতে তো সীমারেখা পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায় নি। উত্তর পূর্ব ভারত, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল (বিশেষতঃ চট্টগ্রাম) ও মায়ানমারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। ভারতেতো মিজো-কুকি-চিন প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকজনও তাদের আত্মীয়স্বজন এখনো বিয়ে-মৃত্যু-সামাজিক অনুষ্ঠানে ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে যাতায়াত করে। তাদের জন্য FMR(Free Movement Regime) এখনো চালু আছে, যদিও মণিপুরের ঘটনার পর কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। আসলে, মানুষ কি কোনো দিন স্থির ভাবে কোথাও স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে না সেটা সম্ভব হয়েছে? গোটা মানব সভ্যতার ইতিহাসই হলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্থান পরিবর্তন, সংঘাত, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মিলন, নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে। কোথাও কোনো স্থায়ী ও বিশুদ্ধ জনগোষ্ঠী কি আদৌ থাকা সম্ভব? চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলে তো আরও কয়েকটা জনগোষ্ঠী আছে,যাদের বিস্তৃতির পরিধিরয়েছে এলাকার বাইরেও, যেমন চাকমা,মার্মা (এককালেযারা 'মগ' হিসাবে খ্যাত ছিল)। তবে যেহেতু তারা মূলতঃ বুদ্ধিস্ট, তাই মায়ানমারে অসুবিধেয় পড়ে না যদিও বাংলাদেশে আবার চিত্রটা ঠিক উল্টো। মুশকিলটা এখানেই, যখন শাসকের পরিচয় হয় বিশেষ ধর্মীয় আনুগত্যের। তখন যুক্তি তর্কের বদলে মূল প্রতিপাদ্য হয় রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও পক্ষপাতদুষ্ট বয়ান, যা তৈরি করতে সচেষ্ট হয় তার স্বতন্ত্র narrative।

আরাকান অঞ্চল আরব বণিকদের কাছে 'রোহাঙ' বলে পরিচিত ছিল,সম্ভবতঃ রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি তা থেকেই, অর্থাৎ 'আরাকানের বাসিন্দা'। রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর উদ্ভব সম্ভবত যখন আরব ও পারসিক বণিকদের একটা অংশ ও তাদের সহযোগীরা থেকে যায় চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে। সংসার পাতে স্থানীয়দের সঙ্গে, চট্টগ্রাম বন্দর তখন দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক বন্দর। চতুর্দশ শতাধীতে ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁওয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আরাকান রাজদরবারে এদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সম্ভবতঃ ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তির কারণে। সেই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ফার্সিতে দলিল লেখার একটা চল ছিল।

পরবর্তী কালে সাজাহান পুত্র শাহ সুজার সঙ্গে আসা মোগল বাহিনীর একটা অংশওসম্ভবতঃ এদের সঙ্গে যোগ দেয়। আর, তার সাথে নিশ্চিত ভাবে ছিল আরাকান অঞ্চলে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রেরিত কৃষককূল। সব মিলিয়ে আরাকান অঞ্চলে (রাখিন প্রদেশে) তৈরি হয় একজন গোষ্ঠী যারা প্রধানতঃ মুসলিম, যাদের ভাষা আরবি-ফার্সিও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংমিশ্রণ। লেখার হরফ বর্তমানে পরিবর্তিত (modified) আরবি (হানিফি হরফ), কিংবা কিছু ক্ষেত্রে ল্যাটিন বর্ণমালা।

আসলে প্রশ্নটা যতটা না জাতিগত, সম্ভবতঃ তার থেকে বেশি ধর্মীয় আনুগত্যের। সে আর কী করা যাবে? তবে,বারে বারে আক্রান্ত হলেও মারাত্মক আঘাত নেমে আসে ২০১৭ সালে। তিনশোর বেশি গ্রাম ভস্মীভূত হয় সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে, কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ যায় এবং উৎপাটিত হয় ১৫ লক্ষের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ। যারা পড়েছিল তারাও বিতাড়িত হয়েছে পরবর্তী কালে, অল্প কিছু দেশের মধ্যে, বেশিরভাগই বাইরে। মূল অংশ এসেছে বাংলাদেশে, তাছাড়া থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশেও গিয়ে পৌঁছেছে অতি বিপজ্জনক ভাবে অনেক ক্ষেত্রে নৌকায় আরোহী হয়ে। নিঃসন্দেহে, তাদের একটা ভালো অংশ হারিয়ে গেছে চিরতরে। সারা পৃথিবীতে ethnic cleansing এতো বড় উদাহরণ আর কটা আছে বলতে পারেন?

ভারতে ঠিক কতজন রোহিঙ্গা আছে? সুপ্রিম কোর্টে সাম্প্রতিক কালে একটি জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ করা হয়, এই বছরের মে

মাসে চল্লিশ জন রোহিঙ্গা যাদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধও ছিল, তাদের দিল্লি থেকে প্রথমে আন্দামান ও পরে নৌবাহিনীর জাহাজে নিয়ে গিয়ে মায়ানমার উপকুলের কিছু দূরত্বে লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হয়। অভিযোগ রাখেন প্রবীণ আইনজীবী কলিন গনসালভেস। প্রাথমিক ভাবে সুপ্রিম কোর্ট অভিযোগকে পুরো উড়িয়ে দেয়। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, beautifully crafted story! তবে, United Nations এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে খোঁজ খবর করায় এবং BBC প্রতিবেদন রাখায়, মামলা পরে সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চে পাঠানো হয়। কোর্টে ভারত সরকার থেকে জানানো হয়, চুয়াল্লিশ হাজারের মতো রোহিঙ্গা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। ভারত সরকারের ক্ষেত্রবিশেষে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়, এবং এ ক্ষেত্রে সরকার এদের 'টেররিস্ট' হিসেবেই গণ্য করছে। তাই এদের ভারতে থাকার অধিকার নেই। প্রসঙ্গতঃ, এটা উল্লেখ করা উচিত, ১৯৫১ সালে UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) তৈরির সময়ে এবং পরে ১৯৬৭ তার বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবের কোনোটাতেই ভারত সরকার signatory নয়। পণ্ডিত নেহরু ও পরবর্তী কংগ্রেস সরকারের এই কাজে অন্ততঃ বর্তমান সরকারের যথেষ্ট খুশি হওয়া উচিত। ভারতে থাকা রোহিঙ্গাদের প্রায় ২২ হাজার UNHCR রেজিস্ট্রার্ড হলেও (কোর্টে বলা হয় ৮ হাজার), ভারতে তার কোনো আইনি গুরুত্ব নেই। যেমন ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবে আছে, কোনো উদ্বাস্তুকে তার শত্রু স্থানীয় দেশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়।

তবে, এই সব উচিত-অনুচিত নিয়ে কে মাথা ঘামায়?! ডিটেনশনে থাকা রোহিঙ্গাদের জোর করে বাংলাদেশ এ মায়ানমার সীমান্ত পার করে দেওয়ার অভিযোগও অব্যাহত, কোর্টের শুনানি হোক বা না হোক!!

প্রশ্নটা হলো, ভারত সরকারের কাছে কি এমন কোনো তথ্য আছে যে এদেশে রোহিঙ্গারা কোনো বিশেষ ষড়যন্ত্রে জড়িত? যদি থাকে তাহলে তো তা অবশ্যই সামনে নিয়ে আসা দরকার। নাহলে, সেই ব্রিটিশ শাসনের ট্র্যাডিশন অনুসারে একটা পুরো জাতি বা গোষ্ঠীকে 'অপরাধী' তকমা লাগানো কতটা যুক্তিযুক্ত হবে বলতে পারেন?

এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তো যেখানে সেখানে রোহিঙ্গা দেখতে পাচ্ছেন। হতেই পারে, তৃণমূল দল কিছু রোহিঙ্গার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে যথারীতি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু, সেগুলো তো সুনির্দিষ্ট ভাবেই বিরোধী দলনেতার জানার কথা, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের মাধ্যমে ; বরং সেই সুনির্দিষ্ট তথ্যগুলোই তুলে ধরুন। সারা ভারতে জম্মু কাশ্মীর, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, কেরালা, আসাম ও পঃ বাঙলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আছে খুব বেশি হলে আশি হাজারের কিছু বেশি রোহিঙ্গা (latest estimate by UNHCR)। তাহলে, এই রাজ্যে কতো থাকতে পারে, আট থেকে দশ হাজার, কিংবা আর একটু বেশি?! তারাই সর্বত্র দৃশ্যমান আর সব নষ্টের মূলেও সেই তারাই??!

একটা বিষয়ে আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে কেন রোহিঙ্গাদের নিয়ে প্রগতিশীল বা বামপন্থীদের সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া নেই! হতে পারে ওদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা বা শিল্প সাহিত্য সেভাবে অগ্রসর নয়, কিংবা এই সব বিতর্ক থেকে হয়তো সযত্ন দূরত্ব রাখাই শ্রেয় অন্ততঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে!!

রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝা শক্ত। তবে,রোহিঙ্গারা ভালো না খারাপ এই বিতর্কে না ঢুকেও একটা কথা বোধহয় পরিষ্কার করে বলা যায়, এদের মতো হতভাগ্য গোষ্ঠী খুব কম আছে। না, এদের জন্য চোখের জলও ফেলতে হবে না, বা সহানুভূতিও দেখাতে হবে না; শুধু দয়া করে এদের একটা আতঙ্কের বিষয়বস্তু ভূত প্রেত দত্যি দানোর মতো কিছু তৈরি করার চেষ্টা করবেন না। এমন যেন না হয় যে মায়েরা বাচ্চাদের খাওয়ানো বা ঘুম পাড়ানোর আগে বলবেন ' ওই দেখ রোহিঙ্গা আসছে।'

(লেখাটি The Doctorós Dialogue এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। লেখক চিকিৎসক আন্দোলনের নেতা।)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আচার্য বিনোবা ভাবে
এক বিরল সমাজ সংস্কারক

মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুরআন সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণা তৈরি হয় একটি ছোট বই পড়ে তার নাম ' কুরআন সার ', Essence of Quran. হাওড়া স্টেশনে সর্বোদয়ের স্টলে পাওয়া এই বইটি আমার জন্য ইসলামকে জানার এক সঠিক পথনির্দেশ দেয়। লেখক বিনোবা ভাবে। মূল আরবীতে কুরআন পড়ে তিনি বিভিন্ন সুরার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এখানে দিয়েছেন। বিনোবা সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ে। আমার স্মৃতিতে এই নামটি তার মৃত্যুর সাথে জড়িত। তখন খবরের কাগজে দেখেছিলাম এই মানুষটি প্রায়োপবেশনে মারা যাচ্ছেন অর্থাৎ সব রকমের অন্নগ্রহণ বন্ধ করে মারা যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধও রাখেননি। আমি ভেবেছিলাম বড় কোনো সাধুবাবা যিনি এইভাবে চলে গেলেন। কিন্তু একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ সাধু কুরআন সার লিখবেন, এটা বেশ কষ্টকল্পিত ঠেকেছে। পরে যেটুকু শুনলাম তা সবই নিন্দেমন্দ। তিনি জরুরী অবস্থাকে অনুশাসন পর্ব বলে প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বশংবদ এবং গোরক্ষা নিয়ে খুব মাতামাতি করেছেন। ফলে ওঁকে নিয়ে আর ভাবতে চাইনি।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধির কাজ নিয়ে দেখতে গেলেই তার উত্তরসূরী হিসাবে বিনোবার নামটিই বারবার উঠে এলো। শুধু অন্যের চোখ দিয়ে না দেখে নিজে জানার চেষ্টা করলাম। তার সাথে যুক্ত হল ওয়ার্দ্ধা এবং পৌনার যাত্রা।

বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। এমন আপ্তবাক্যের দেশে স্বেচ্ছায় একরের পর একর জমি মানুষ দিয়ে দিচ্ছেন, এ কথাটা ভাবতেই কেমন লাগে। কিন্তু ১৯৫১ সালে এমনই ঘটনা ঘটেছিল পোচামপল্লীতে যা আজকের তেলেঙ্গানার অন্তর্গত। বিনোবা গিয়েছিলেন সেখানে এক হরিজনপল্লীতে। ভূমিহীন এই চল্লিশটি পরিবার তাঁকে জানায় পরিবারপিছু দুই একর জমি হলে তারা বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। সেই জমির জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করতে হবে। আর কি অন্য উপায় নেই? যে সব মানুষ বিনোবার কারণে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন , তাদের একজন বললেন আমি একশ একর দেব। এই দান থেকেই শুরু হল ভূদান আন্দোলন। গ্রাম থেকে গ্রামে ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি নিয়ে ভূমিহীনদের দেওয়া হল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চলল এই যাত্রা। সারা দেশে বিনোবাজি পায়ে হেঁটে অসংখ্য গ্রাম পরিক্রমা করলেন ।তিনি কোনও রকম যন্ত্র শকটে চড়তেন না। জানিনা এত হাজার হাজার মাইল পদযাত্রা আর কেউ করেছেন কিনা। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লক্ষ একর জমি এভাবেই পাওয়া গেল। গোলা গুলি না চালিয়ে এত জমি? এর পর হয়েছিল গ্রামদান। গোটা গ্রামের সম্পদ একসাথে করে সকলে মিলে কাজে লাগানো। এই সমস্তই একদা সম্ভব হয়েছিল।

এই জমিতে এক অন্যরকম চাষের কথা বলতেন বিনোবা। ঋষি খেতী। আজকের প্রাকৃতিক চাষের সাথে যার অনেক মিল। মাসানোবু ফুকুওকা যা করেছেন জাপানে। সার, কীটনাশক, যন্ত্রের চাপে জর্জরিত চাষ নয়, এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় তখন কারো মন ছিল না। তখন সামনে লক্ষ্য অধিক উৎপাদন। আজ অবশ্য কোম্পানীরা ঐ চাষেরই ফসল অর্গানিক নাম দিয়ে বাজারে আনলে মূল্য বেড়ে যায় বহুগুণ।

মহারাষ্ট্রের পাওনারে বিনোবার তৈরি করা আশ্রমে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন সেখানকার আবাসিক গোটা দেশ থেকে আসা মেয়েরা।

বিনোবা মূলতঃ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। খুব কম বয়স থেকেই তাঁর এই খোঁজ ছিল। কিন্তু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নে গান্ধিজির যে ভাষণ তা পড়ে তিনি গান্ধিজিকে চিঠি লেখেন এবং গান্ধিজি তাঁকে সবরমতী আশ্রমে ডাকেন। পৌঁছালে গান্ধিজি তাঁকে সাথে সাথেই তরকারি কাটতে বসিয়ে দেন, তিনি নিজেও তাই করছিলেন। এই প্রথম সাক্ষাতেই বিনোবা তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। তারপর গান্ধিজির বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের সাথে যুক্ত থাকা, জেল যাওয়া ইত্যাদি। জেলে থাকাকালীন তিনি বহু ভাষা শেখেন। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং তাঁর মায়ের ইচ্ছায় গীতার মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করেন যেটি 'গীতাঈ' নামে পরিচিত। তার ৪০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। ওয়ার্দ্ধার কাছাকাছি গোপুরীতে গীতাঈ মন্দির নামে এক অভিনব মন্দির দেখেছি। মুক্ত অঙ্গনে এদিক ওদিকে রাখা ১৮টি গ্রানাইটের পাতে বিনোবার গীতাঈ এর ১৮টি অধ্যায় খোদাই করা আছে। এই স্থলটির শিলান্যাস করেন সীমান্ত গান্ধি খান আবদুল গফফার খান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিনোবা গিয়েছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। তার ভূদানের ঢেউ সেখানেও পৌঁচেছিল। সেখানে কেউ তাকে জয় পাকিস্তান বলায় তিনি বলেন 'জয় জগৎ'। কোনও একটি রাষ্ট্রীয় সীমায় আবদ্ধ ভূমি নয় তিনি সমগ্র জগতের কল্যাণ চেয়েছেন। জয় জগৎ নাম নিয়ে সম্প্রতি এক পদযাত্রা এ দেশ থেকে শুরু হয়ে ইওরোপ পৌঁচেছে শান্তি, মৈত্রী, সর্বোদয়ের ভাবনা নিয়ে।

তিনি ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীকে তাঁদের মতামত না নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গান্ধিজির ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম সত্যাগ্রহী। তিনি গ্রেপ্তার হন ও তাঁর দুই বছর কারাদণ্ড হয় ।গান্ধিজির আন্দোলনের দিকের পাশাপাশি নির্মাণের কাজটি অত বেশি আলোচিত হয় না। কারণ আন্দোলনের রোমাঞ্চ সেখানে নেই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বোদয়ের জন্য নবনির্মাণের কাজটিই জরুরী ছিল।

স্বাধীনতার পর গান্ধিজির হিন্দ স্বরাজ, গ্রাম স্বরাজ সবই বাতিল করে কর্ণধারেরা বড় বড় শিল্প , বৃহৎ জলাধার (ড্যাম), নদী বাঁধ প্রকল্প এই সব নির্মাণের পথে হাঁটলেন ।গান্ধিজি বলেছিলেন এবার কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে কর্মীরা দেশের সাত লক্ষ গ্রামে গিয়ে সর্বোদয়ের কাজ করুন। বিনোবার ভূদান তারই একটি অংশ। কিন্তু সর্বোদয় আর ইন্ডিয়া শাইনিং সম্পূর্ন ভিন্ন ভাবনা। তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য পণ্ডিত নেহরু পৌনার আশ্রমে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিনোবাজি জানালেন তিনি নিজেই যাবেন ।তিনি গাড়ি চড়তেন না । তাই হেঁটে দিল্লি গেলেন ।তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন দুটি পাঁচশালা পরিকল্পনার পর (১৯৫২ ; ১৯৬২) ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ আরও বেড়েছে। পণ্ডিত নেহরু তাঁর কথা শুনে বিশিষ্ট রাশি বিজ্ঞানী ড. প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবিশকে দায়িত্ব দেন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিতে। ড. মহলানাবিশের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে দেখা গেলো বিনোবাজির বক্তব্য একদম সঠিক ।

গোপাল গান্ধির একটি লেখার সূত্রে জানা যায় গান্ধিজিকে হত্যার কিছু পরে ১৯৪৮ সালের মার্চে সেবাগ্রামে গান্ধিজির পর কী, এই বিষয় নিয়ে তিনদিন ধরে আলোচনা হয়। নেহরু থেকে শুরু করে সমস্ত নেতারাই সেদিন ছিলেন। বিনোবা চুপচাপ রইলেন। পরে তৃতীয় দিনে রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধে তিনি বলেন আপনারা মহাত্মার হত্যার ঘটনায় রেগে আছেন। আমি এই ঘটনায় অনুতপ্ত। আমি মহারাষ্ট্রের সেই বর্ণ থেকে আসছি যারা এই হত্যাকান্ডের মূল

পরিচালক। এরা ফাসিস্ত। এরা ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করছে। গীতার ব্যাখ্যা তো আমিও করেছি। কিন্তু এদের ব্যাখ্যায় এরা অর্জুনের উদাহরণ দিয়ে মানুষকে হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। এদের এক অন্য দর্শন আছে। আজকের ভারতে এই বিধ্বংসী দর্শনের সাথে লড়ার জন্য বিনোবাকে নতুন করে দেখতে হবে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর বিনোবা ভাবের জন্মদিন ছিল। ১৮৯৫ সালে তাঁর জন্ম ।এই বছর তাঁর ১৩০ তম জন্মবার্ষিকী ।

ইরান : জানা-অজানা কিছু কথা

মজিবুর রহমান

পারস্য সাম্রাজ্য যেমন অতীত ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ইরান তেমনি বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। ইরান ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। সাম্রাজ্যটি পারস্য উপসাগরের উপকূলে গড়ে ওঠে। এজন্য সাগর ও সাম্রাজ্য একই নামে পরিচিত হয়েছে। গ্রীকরা এই অঞ্চলকে ডাকত পার্সিস বলে যা বাংলায় লিপ্যন্তর করা হয় পারস্য হিসেবে। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বহির্বিশ্বে দেশটি পারস্য নামে পরিচিত ছিল। ওই বছর থেকে শাহ মোহাম্মদ রেজা পহলভির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাবে ইরান নামটির ব্যবহার শুরু হয়। এখন এলাকাটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পারস্য আর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইরান নামে পরিচিত।ইরান একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ আর্যদের দেশ।

ইরান নিয়ে আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রসঙ্গ না এসে পারে না। আফ্রিকা, ইউরেশিয়া,ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ইরান, ইরাক, ইয়েমেন, ইসরাইল, ফিলিস্তিন, বাহরাইন, লেবানন, মিশর, জর্ডন, তুরস্ক ও সিরিয়া সহ প্রায় দেড় ডজন দেশের সমষ্টি। বিশ্বব্যাপী মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল ধর্মীয়, ভূ-প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই অঞ্চলে ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হয়। মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বরাজনীতির একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র। তেল সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকার ফলে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের দেড় ডজন দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত সৃষ্টির কারণে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারে এগিয়ে থাকে এক গণ্ডা দেশ- ইরাক, ইরান, ইসরাইল ও ফিলিস্তিন। ঠিক এই মুহূর্তে ইরান নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার পেছনেও রয়েছে শেষোক্ত তিনটি দেশের সাম্প্রতিক যুদ্ধাভিযান।

৯ কোটির অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট ইরান বিশ্বের ১৭তম জনবহুল দেশ। এটি সাড়ে ১৬ লাখ বর্গ কিলোমিটার আয়তন নিয়ে বিশ্বের ১৭তম বৃহত্তম দেশও বটে। মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সৌদি আরবের (সাড়ে ২১ লাখ বর্গ কিলোমিটার) পরেই ইরানের স্থান। ইরান তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে যথাক্রমে নবম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই তেল ও গ্যাস রপ্তানি ইরানের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি; জিডিপি'র ৮০ শতাংশ। আর্থিক শক্তির নিরিখে বিশ্বে ইরানের স্থান ৩৬তম। ইরানে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে। জন্মহার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ইরানে নারীর অধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশটিতে নারীরা ভোটাধিকার পায় ১৯৬৩ সালে। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর পর্দা প্রথার কঠোরতা সহ নানান ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাহসা আমিনী নামক এক তরুণী নীতি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এবং পুলিশ হেফাজতে মারা যান। এই ঘটনার প্রতিবাদে 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' স্লোগান দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয় তা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। সম্প্রতি শিক্ষা ও চাকরিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। ইরানের আইনসভায় ৬ শতাংশ নারী রয়েছেন।

ইরানে সাক্ষরতার হার ৯০ শতাংশ। দেশটিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা ফার্সি শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইরানের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীনকাল থেকেই পারস্য গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিগত তিন দশক ধরে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স এবং ন্যানো প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইরানে জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে যা দেশটির জিডিপি'তে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ভাবে পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে ইরানে ধর্মের প্রবল প্রাধান্য রয়েছে। ১৯৭৯ সাল থেকে সাংবিধানিকভাবে দেশটির নাম হয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান। ইরানের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ শিয়া মুসলমান। ৫-৭ শতাংশ সুন্নি মুসলমান। বাকিটা বাহাই, খ্রিস্টান, জরথুষ্ট্রীয়, ইহুদি ও সাবেইয়ান। ২৯০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৫টি সুন্নি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। উল্লেখ্য, পারস্যের মাটিতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জরথুষ্ট্রবাদের উদ্ভব হয়; ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা। ভারতে এই ধর্মের অনুসারীরা পার্সী নামে পরিচিত। পার্সীরা অগ্নি উপাসক হন। যাইহোক, সপ্তম শতকের পরে পারস্যের মানুষ ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে এবং জরথুষ্ট্রবাদ মাতৃভূমিতেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইরানে বহুদিন ধর্মনিরপেক্ষ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজতন্ত্রের সর্বশেষ শাসক ছিলেন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি। ১৯৫৩ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি একটি আধুনিক

পশ্চিমাপন্থী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এতে রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে শাহের শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। রাজতন্ত্রের অবসান ও রাজপরিবারের দেশত্যাগের এই ঘটনা ইরানি বিপ্লব বা ইসলামী বিপ্লব নামে খ্যাত। বিপ্লবের পর ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী দেশের প্রধান ধর্মগুরু তথা সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ইরানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরের বছরই ১৯৮০ সালে আঞ্চলিক আধিপত্য কায়েমকে কেন্দ্র করে ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হয় যা ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চলে। ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী আর ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার এই দীর্ঘ মেয়াদী লড়াইয়ে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যায় ও সম্পদহানি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাককে সমর্থন করে। এজন্য ইরান কুয়েতের জাহাজের ওপর আক্রমণ চালায়। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে ইরাক কুয়েত দখল করে নেয়। এই সময়ে ইরান কুয়েত দখলের নিন্দা করলেও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সামরিক জোট কুয়েতকে ইরাকের কবল থেকে মুক্ত করার পর ইরান ও ইরাকের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। সাদ্দাম হোসেন ব্যাপক ধ্বংসাত্মক জীবাণু অস্ত্র তৈরি করছেন এমন যুক্তি বা অজুহাত দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক জোট ২০০৩ সালে ইরাকের ওপর আঘাত হানে। ১৩ই ডিসেম্বর সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর ইরাকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বাড়াতে সক্ষম হয়।

১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লব এবং পাহলভি রাজবংশের পতনের আগে পর্যন্ত ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বাধীন ইরান ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৪৮ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি গণতান্ত্রিক ইসরাইল ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরানের সম্পর্ক বিগত সাড়ে চার দশক ধরে যথেষ্ট বৈরিতাপূর্ণ থাকতে দেখা গেছে। ৭৫ শতাংশ ইহুদির দেশ ইসরায়েলে মুসলমানের সংখ্যাও প্রায় ২০ শতাংশ। জনসংখ্যা (এক কোটি) ও আয়তনে (২২ হাজার বর্গ কিলোমিটার) ইসরাইল ইরানের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। সামরিক শক্তিতেও ইরান ইসরাইলের থেকে এগিয়ে রয়েছে। ইরানের সক্রিয় ও সংরক্ষিত সৈন্য সংখ্যা যথাক্রমে ৬ লাখ ও ৩৫ হাজার। অন্যদিকে ইসরায়েলের রয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার সক্রিয় এবং ৪৫ হাজার সংরক্ষিত সৈন্য। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের বলিষ্ঠ বন্ধুত্ব শেষোক্ত দেশটির একটি বড় প্লাস পয়েন্ট। তাছাড়া আয়ুষ্কাল, শিক্ষা, মাথাপিছু আয় সহ মানব উন্নয়ন সূচকের অন্যান্য দিক থেকেও ইসরাইল একটি অত্যন্ত উন্নত দেশ। বিশ্বের বহুসংখ্যক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেধাশক্তির বিচারে ইহুদিরা এক নম্বরে। এজন্য 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্য সহ গোটা বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। ফিলিস্তিন ও গাজার সঙ্গে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতে ইসরাইল অনেক এগিয়ে থাকলেও এবছর জুন মাসে ইরানের সঙ্গে লড়াইয়ে বিশেষ সুবিধা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি এল ও) ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবকে সমর্থন করে। বিপ্লবের পর ইরান ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে মিত্রতামূলক সম্পর্কের সূচনা হয়। প্রতীকী হিসেবে তেহরানের ইসরায়েলি দূতাবাস ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইরান এখন হামাসকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ইরান বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়। সেই থেকে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বিদ্যমান। ১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবের পর ইরানকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশগুলোর একটি ছিল পাকিস্তান। বেলুচিস্তান প্রদেশটি ইরান ও পাকিস্তানের সীমানার উভয় দিকেই বিস্তৃত। উভয় দেশ বেলুচিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাস দমন, মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। ইরান ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তা করে। অনুরূপভাবে ১৯৮০-৮৮ সালের যুদ্ধে ইরান-ইরাক যুদ্ধে পাকিস্তান ইরানকে সমর্থন করে।

স্বাধীন ভারত ও ইরানের মধ্যে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে স্বাগত জানানো সম্ভব হয়নি। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইরান পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। আবার ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ভারতের সমর্থন ছিল ইরাকের প্রতি। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ভারত ও ইরান একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক মূলত ইরান থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ২০১০ সালে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কাছে কাশ্মীরের আজাদির আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকার ইরানি নেতার এই আচরণের নিন্দা করে। ২০১৬ সালের মে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইরান সফরে যান। এই মুহূর্তে ইরানের সঙ্গে চীনের আর ভারতের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক ভালো। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য ভারত ও ইরানের মধ্যে সবসময় একটি মানসিক দূরত্ব তৈরি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের শিয়া মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইরানের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরক্ত।

একসময় রেডিও তেহরান-এর খবর বাঙালি মুসলমানের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল।

কোনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মীয় রাষ্ট্রে লিঙ্গবৈষম্য থাকেই। ইসলামী ইরানে এই সমস্যাগুলো রয়েছে। মুসলিম বিশ্বে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রকেও অনুপ্রেরণা যোগাবে। ইরানের অভিধানে আত্মসমর্পণের স্থান নেই। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইরান আপাতত এগিয়ে চলেছে।

স্মরণ

বদরুদ্দিন উমর

শুভ বসু

বদরুদ্দীন উমর প্রথিতযশা ঐতিহাসিক। তিনি আজীবন মার্ক্সবাদের চর্চা করেছেন। তাঁর লেখার সংখ্যা প্রচুর। তাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। তিনি তিন খন্ডে এই কাজে বাংলাদেশে বঙ্গবিভাগের পর পাকিস্তান আমলের সূচনায় যে আর্থ সামাজিক পরিবর্তন হয়েছিল তার একটি ছবি এঁকেছেন। অনেকটা লেফেবের ফরাসি বিপ্লবের মতো বিরাট ক্যানভাসে আঁকা ছবি। কৃষক শ্রমিক এবং উদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন ধারার রাজনীতির সংমিশ্রনে ভাষা আন্দোলনের বিকাশ। আমার মতে এর সূচনা হয়েছিল কলকাতায় যখন পূর্ব বাংলা রেনেসাঁস সোসাইটি তৈরী হয়। পাকিস্তান আন্দোলন কে একমাত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখে জিন্নাহ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এবং উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক দর কষাকষি পাকিস্তান আন্দোলনের একমাত্র চিন্তা নয়। পূর্ববঙ্গে প্রজা আন্দোলন এবং আইরিশ মডেলের দৃষ্টিতে লোক সংস্কৃতির পুনর্জীবন এর লক্ষ্য ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণী এবং তাঁদের থেকে উঠে আসা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উর্দু ভাষী আশরাফ যাঁরা গ্রামের দেহাতি পাঞ্জাবি সরাইকি , সিন্ধি বা পাখতুন সংস্কৃতির খুব খোঁজ রাখতেন না। ১৯৩০ সালে কবি ইকবাল সাহেবের মুসলিম লীগের সারা ভারত সম্মেলনে যে ভাষণ তাতে পূর্বাঞ্চলের কোনো উল্লেখ নেই ।এমন কি চৌধুরী রহমত আলীর ১৯৩২ সালে যে পাকিস্তান বলে নামকরণ তাতে কোন উল্লেখ নেই বাংলার।

পূর্ববঙ্গের উদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে হয়েছিল তাঁরা কলকাতা কেন্দ্রিক এক সাংস্কৃতিক অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদের শিকার। তার থেকে মুক্তির জন্যে তাঁরা লোক সংস্কৃতির অঙ্গনে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরী হয় তার সঙ্গে লোক সংস্কৃতির যে বহুমুখী প্রকাশ তার কোনো সংযোগ ছিল না। আর রাষ্ট্রর গঠন কাঠামো হয়ে পড়েছিল আমলাতন্ত্র নির্ভর এবং পরে তা সামরিক জান্তার অধীনে চলে যায়, যাকে পাকিস্তানী সমাজতাত্ত্বিক হামজা আলাভী বলেছেন সামরিক এবং আমলাতন্ত্রের সংযোগ। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্তানে বিশেষত পূর্ব বঙ্গে (যা ছিল পাকিস্তানের পূর্বাংশের সরকারি নাম ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়নের আগে পর্যন্ত) সেই সময়ের প্রজা আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলন এবং মধ্যবিত্তর আশা আকাংখ্যার এবং তার সঙ্গে বাস্তবের যে দূরত্ব সেই পটভূমিতে তৈরী হয়েছিল ভাষা আন্দোলন। এর একটি আর্থ সামাজিক ভিত্তি ছিল পূর্ববঙ্গের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে। উমর সেই ছবিটা এঁকেছেন। কোনো লেখাই সমালোচনার উর্ধে থাকে না। উমর এর লেখায় হয়তো অনুল্লেখিত থেকে গেছে নানা বিষয় এবং কোনো পরবর্তীকালের বড় নেতার নাম। কিন্তু তাঁর লেখার গুরত্ব তাতে কমে না।

উমর সাহেবের বহু লেখা আছে যাতে যান্ত্রিক ভাবে মার্ক্সবাদের এবং শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাখ্যা রয়েছে। তাঁর ইংরেজিতে লিখিত বাংলাদেশের বিবর্তন গ্রন্থটি একটি উদাহরণ। তাঁর সাম্প্রদায়িকতার উপরে লেখাতে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে তাত্ত্বিক তফাৎ প্রণিধান যোগ্য। তবে তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফলে অনেক লেখাই তাঁর সাংবাদিকতা ও আশু রাজনৈতিক কর্তব্যের উপর নির্ভর করে লেখা।

রাজনীতিবিদ হিসাবে উমর সাহেব ব্যর্থ। তিনি সমালোচনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বা আরো গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মৌলানা আধুল হামিদ খান ভাসানীর ইসলামিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে। মৌলানা আধুল হামিদ খান ষাটের দশকের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মননের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগসূত্র ছিলেন। মৌলানা আধুল হামিদ খানের রাজনীতি থেকে বাম বিপ্লবী ধারার রাজনীতি সরিয়ে এক সংকীর্ণ চোরা গলিতে উমার সাহেব এবং তাঁর সহযোগীরা নিয়ে গিয়েছিলেন । শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বাবা আবুল হাসিম সাহেবের সোহরাওয়ার্দি কে নিয়ে বিরোধ ছিল। আবুল হাসিম সাহেব সোহরাওয়ার্দির রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান ১৯৪৬ সালের পর থেকে আর শেখ মুজিব , আবুল মনসুর আহমদ বা কামরুদ্দিন আহমদ বা আতাউর রহমান খান ছিলেন সোহরাওয়ার্দির মন্ত্র শিষ্য। ফলে উমর সাহেবের সঙ্গে শেখ মুজিবের উত্তরাধিকার সূত্রে একটা বিরোধ এসেছিলো এবং আর পাঁচ জন উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর মতো উমর সাহেব শেখ মুজিবের মৃত্তিকা সংলগ্ন রাজনৈতিক আবেদনের মূল সুর বুঝতে পারেন নি। তবে সে যুগের ঠান্ডা যুদ্ধর পরিস্থিতি , সেই সময় মাওৎসেডং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের

দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্মীদের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন ছিল। উমর সাহেবের সেই রাজনৈতিক ব্যর্থতা মাওবাদী আন্দলোনের একাংশের তাত্ত্বিক ব্যর্থতা। সে জন্যে তাঁকে একা দায়ী করে কোনো লাভ নেই ।

বদরুদ্দীন উমর বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাঁর বাবা আবুল হাসিম সাহেব কে বর্ধমান ছেড়ে চলে যেতে হয় ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর । যদিও ওই দাঙ্গা হয়েছিল পূর্ব বাংলায় । তাঁদের পরিবার ওই দাঙ্গায় আদৌ আক্রান্ত হননি । একথা তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকমেমলকে তাঁর 'সীমান্তরেখা' ছবির সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন। উমর সাহেবের পরিবারের একাংশ বর্ধমানে থেকে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীকে শক্তিশালী করেন। তাঁদের মধ্যে নন্দন প্রত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেব এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহর নাম উল্লেখ যোগ্য। উমর সাহেব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। তাঁর সামনে প্রথাগত ক্যারিয়ার তৈরির সুযোগ থাকলেও উমর সাহেব সব ত্যাগ করে বাম বিপ্লবী রাজনীতিতে আসেন। তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী মানুষ। কোনোদিন তিনি খেতাব পদবীর ধার ধরেন নি। আর তাঁর নিজের মতাদর্শে ছিল ধ্রুব বিশ্বাস। সেই কারণ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় মার্ক্সবাদী ঘরানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। লাল সেলাম উমর সাহেব।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা এবং বদরুদ্দিন উমরের ব্যাখ্যা

অজিত কুমার রায়

(লেখাটি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ঐ দেশের বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন উমর তাঁর একটি প্রবন্ধে কিছু মতামত ব্যক্ত করেন জ্জ তাঁর এই প্রবন্ধটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় জ্জ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অজিত কুমার রায়ের এই নিবন্ধটি আমরা প্রকাশ করলাম । সম্পাদক, নাগরিক ।)

সম্প্রতি (অগাষ্ট, ২০১২) বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত বদরুদ্দিন উমর 'ভারত ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা' নামক প্রবন্ধে দাবী করেছেন যে

'এদিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা ভারত ও পাকিস্তানের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। বাংলাদেশে এখন দুর্নীতি, চুরি, ঘুষখোরি, সন্ত্রাসের রাজত্ব। এখানে ১৯৭২ সাল থেকে মানুষের চরিত্রের অদৃষ্টপূর্ব অধঃপতন হয়েছে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণের গৌরব বোধ করার জায়গা একটাই আছে। তাঁরা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করেছে।...

বাংলাদেশে কোনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নেই। উপরন্তু হিন্দুদের সঙ্গে এখানে মুসলমান জনগণের যে সদ্ভাব আছে সেটা ভারতে, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও নেই।...

কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা অন্য রকম। সব ক্ষেত্রেই হিন্দুরা বেশ ভালোভাবেই উপস্থিত। এখানে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সদ্ভাব ও সহজ সম্পর্ক আছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গে নেই।'

বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্যকে ব্যঙ্গ করার জন্যই সম্ভবত পরের মাসেই ডেইলি স্টারে (০১.১০.২০১২) প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী বড় আকারের সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ঘটনা ঘটল। কক্সবাজারের রামু উপজেলায় এক দল সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মানুষ ১২টি বৌদ্ধ মন্দির ও মঠে এবং বৌদ্ধদের ৫০টির মতো ঘরে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করেছে। পটিয়ায় দুটি বৌদ্ধ ও একটি হিন্দু মন্দিরেও হামলা করা হয়েছে। উখিয়ায় দুটি বৌদ্ধ মঠ ও টেকনাফে পাঁচটি বাড়িতে হামলা করা হয়েছে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলোর মধ্যে আছে শত বছরের পুরনো বৌদ্ধ গুম্ফা , বৌদ্ধদের কাছে যা অতি পবিত্র স্থান। এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বও ছিল যথেষ্ট।

সত্যি কি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটিত হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে তবে কবে থেকে হয়েছে এবং কি ভাবেই বা তা সম্ভব হলো? পৃথিবীর বহু দেশেই সাম্প্রদায়িক বৈরীতা এবং হানাহানি সভ্যতার লজ্জা হিসাবে আজো প্রতিনিয়ত তার অস্তিত্বের জানান দেয় , কখনো ধর্মের নামে, কখনো জাতির নামে, কখনো বর্ণের নামে, কখনো ভাষার নামে। আমাদের আরো বিশ্বাস ছিল যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবনার জন্ম নেওয়ার অর্থনৈতিক কারণগুলি না থাকলে সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব ভিত্তি দূর হবে। সত্তর বছরের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার এবং পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের সেই বিশ্বাস কত ভ্রান্ত ছিল। সত্তর বছরের বৈষম্যহীন জীবনচর্চাও তাদের সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব থেকে মুক্ত করতে পারে নি।

এই অবস্থায় যদি বাংলাদেশে তা নির্মূল হয়ে থাকে তবে সকলের পক্ষেই তা আহ্লাদের এবং শিক্ষণীয় বিষয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, বাস্তব অবস্থা বলছে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে ক্রমাগত কমেই চলেছে। পাকিস্তানে তো এখন মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

বদরুদ্দিন উমরের কথা অনুযায়ী যদি সাম্প্রদায়িকতার

মূলোৎপাটন করা এমন বেহেস্ত বাংলাদেশে পয়দা হয়েই থাকে তবে এমনভাবে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করবে কেন? এই পরিপ্রেক্ষিতেই সকলের মনে যে প্রশ্নটি উদয় হয় তা হলো বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা, নিজেদের নিরাপদ মনে করেন না কেন? কেন তাঁরা নিজভূমি ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় খোঁজেন, শরণার্থী হন?

আমাদের উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা শতাধী-প্রাচীন অসুখ। আরো চিন্তার বিষয় এই যে সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির অঙ্গ হয়ে আছে বহুদিন ধরে। বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে জাতি-দাঙ্গা চলছে। যেমন বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে দাঙ্গা না হয়ে ঘটে একপক্ষের আক্রমণ, কেননা সংখ্যালঘুদের করার কিছুই থাকে না, তেমনি মিয়ানমারের ঘটনাকেও দাঙ্গা না বলে মূলতঃ রোহিঙ্গা বা রাখাইন সম্প্রদায়ের উপর একতরফা আক্রমণ বলাই ভালো। এর পরিণামে প্রাণের ভয়ে ভীত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ দেশান্তরী হচ্ছেন। মূলতঃ বাংলাদেশ তাদের গন্তব্যস্থল হলেও ভারতেও শরণার্থী হিসাবে তাঁরা আশ্রয়ের জন্য আসছেন। রোহিঙ্গাদের সমস্যা প্রসঙ্গে পৃথক নিবন্ধে আলোচনা করা যাবে।

কোন দেশের কোন জনগোষ্ঠী যখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে জন্মভূমি হলেও রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় বিধান, বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ ও গণমানসিকতা এমন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে যা তার জীবন-যাপনের জন্য ভয়ঙ্কর প্রতিকূল , তখনই সে দেশত্যাগ করে। কেননা এই প্রতিকূল পরিবেশের সুযোগ নিয়েই একদল ঘৃণ্য স্বার্থান্বেষী মানুষ রাষ্ট্র-প্রশাসনের কাছেও অনাকাঙ্খিত এই জনগোষ্ঠীর উপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলা-নির্যাতন- হত্যা- নারী লুণ্ঠন ইত্যাদি চালায়। এমতাবস্থায়, শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার কোন সুযোগ না থাকার জন্যই নয়, বৃহত্তর গণমানসেও নিশ্চিতভাবেই হামলাকারীদের প্রতি প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষ/ নীরব প্রশ্রয় বা উদাসীনতা বিরাজমান থাকলেই অসহায় মানুষ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে। মূল প্রশ্ন কেন, কখন, কি কারণে কোন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ দেশ ছেড়ে অন্যত্র যায়?

বাংলাদেশের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত সেই বদরুদ্দিন উমর কিছুকাল আগে অপর একটি লেখায় ব্যাখ্যা করে লিখেছেন কেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বাস্তবতা আর বিরাজ করে না। কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন, অধিকাংশ সঙ্গতিসম্পন্ন সম্পদশালী হিন্দু জনগোষ্ঠী দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ভিত্তি বাংলাদেশে আর বিরাজ করে না। অনেকেই তার সাথে নিশ্চয়ই সহমত পোষণ করবেন না, কেননা এ অতি সরলীকৃত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ (economic determinism) দোষে দুষ্ট মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা। বাংলাদেশ বা পাকিস্থান থেকে শুধু সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দুরা চলে এসেছেন এবং এখনো আসছেন তাতো নয়। পূর্ব-পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের কতজন বা কয়টি হিন্দু পরিবার স্বচ্ছল ছিল, জমি-সম্পত্তির মালিক ছিল? নিশ্চয়ই হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নয়। তাহলে কেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের ৩১ শতাংশ হিন্দু জনগোষ্ঠী ক্রমাগত লয় পেয়ে আজ ৭/৮ শতাংশে পৌঁছেছে? এই বিপুল পরিমাণ মানুষ সবাই সম্পদশালী ছিল? পূর্ব-পাকিস্তান হওয়ার পর হিন্দু জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ, যারা আর্থিক ও সামাজিক মানদণ্ডে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়াই ছিল,বরিশালেরযোগেনমন্ডলেরনেতৃত্বে পর্ব-পাকিস্তানেই থেকে গিয়েছিলেন। যোগেন মণ্ডল স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই যোগেন মণ্ডল নিজে ও তাঁর হত-দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ ১৯৫০ সাল থেকে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে চলে আসেন । কেন? তাঁরা কি বদরুদ্দিনের যুক্তি অনুসারে সকলেই সম্পদশালী ছিলেন যে তাদের সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য দাঙ্গা করে, ভয় দেখিয়ে তাদের দেশ ছাড়া করা হয়েছিল? তাঁরা সকলেই ছিলেন কৃষিকাজ, মাছধরা, মাটিকাটা ইত্যাদি কায়িক পরিশ্রমের কর্মে নিযুক্ত সম্বলহীন, সম্পত্তিহীন নিম্নবর্গের মানুষ।

যোগেন মন্ডলের মতো স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে ভারতবর্ষে আসার পর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা খুঁইয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন। কেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোগেন মন্ডলকেও পাকিস্তান ছেড়ে বরাবরের জন্য ভারতে আশ্রয় নিতে হলো তার বিশ্লেষণ উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সামাজিক মানস অনুধাবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্য প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বলবার যে, আমার চেনাজানা বৃত্তেই, যাঁরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন এমন অনেক মানুষের কথাই জানি, যাদের কোন কোন আত্মীয়-পরিজন এখনও সেখানে রয়েছেন। তাদের স্বদেশে থেকে যাওয়ার কারণ হিসাবে শুনি যে বিষয়-সম্পত্তির জন্যই তাঁরা দেশত্যাগ করেন নি। সম্পদশালী সকল হিন্দুই দেশত্যাগ করেছেন উমরের এই কথাও সর্বাংশে সত্য নয়।

আমাদের দেশেও এমন অনেক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অবনমনের ও বিবাদের ঘটনা ঘটেছে যার জন্য এই দেশের নাগরিক হিসাবে লজ্জাই বোধ করি। ভারতে যে হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীর অক্লান্ত সাম্প্রদায়িক প্রচার অব্যাহত থাকার দুঃখজনক বাস্তবতা বিরাজ করে তাও সত্যি। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য হিন্দু মৌলবাদী শ্লোগানের জনমানসে এখনো যে প্রভাব আছে তার প্রমাণ রামরথ যাত্রার রাজনীতি। এই করে যে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করা যে যায় তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। তবু যে কোন শুভবোধসম্পন্ন নাগরিকের কাছে স্বস্তির কারণ এই যে ভারত অন্ততঃ সাংবিধানিক অভিধায় কোন বিশেষ ধর্মের দেশ বলে ঘোষিত নয়, যেমনটি পাকিস্তান বা

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্যি। আমাদের দেশের বিরাজমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে আহ্লাদিত হওয়ার মতো কোন কারণ নেই এবং নিঃসন্দেহে আত্মতুষ্টিতে ভোগা অবিবেচকের কাজ হবে, কেননা সামান্য অনুকূল পরিবেশেই উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সেই আত্মতুষ্টির সুযোগ নিতে পারে। তবু, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ- পরিস্থিতির বিবেচনায় আমার দেশের জন্য প্রাণের আরাম বোধ করি এই ভেবে যে আমার কোন সহ-নাগরিককে সাম্প্রদায়িক বিষবাস্পে জর্জ্জরিত হয়ে প্রাণরক্ষার আশায় অন্ততঃ পার্শ্ববর্তী পরদেশে স্বধর্মের মাঝে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হয় না। যদি কখনো হানাহানির পরিস্থিতি তৈরি হয় তবে সে দেশের মানুষের মাঝেই তার প্রতিকার বা আশ্রয় খোঁজে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উপায় খুঁজে পায়। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ সম্ভবতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জনবিন্যাস বিশ্লেষণে বোঝা যাবে। যেখানে, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু ক্রমাগত অবলুপ্তির পথে বা বিপজ্জনকভাবে ক্রমহ্রাসমান, সেখানে ভারতবর্ষে এই অংশের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বেশ কয়েকটি জেলায় তাঁরা ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে এমন পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কেউ কল্পনাতেও আশা করেন না। আমাদের দেশের একাধিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ রাষ্ট্রপতি হন, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হন, প্রতিরক্ষা গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল পদের প্রধান হন, ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হন, চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তম নায়ক-নায়িকা হন। এর কোনটি বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে সম্ভব নয় বললে বোধ করি কম বলা হবে। আত্মশ্লাঘার কোন অবকাশ না থাকলেও এ কথা নির্দ্বিতায় বলা চলে যে সামগ্রিক সাম্প্রদায়িক সহনশীলতার পরিস্থিতি বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের তুলনায় ভারতবর্ষে অনেকগুণ ভালো। আমাদের দেশে অন্ততঃ বেশকিছু সাংবিধানিক আইনী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা সাম্প্রদায়িক সহনশীলতার বিচ্যুতি ঘটলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে বদরুদ্দিন উমরের ভারত ও পাকিস্তানকে এক বন্ধনীতে রাখা বেশ হাস্যকর।

সঙ্ঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা বা নির্যাতনের পশ্চাতে কারণ হিসাবে কোন অর্থনৈতিক নিয়ামক নেই বা থাকে না, তা প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। যেমন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর করসেবকদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করে গুজরাট দাঙ্গা। এটা সকলেই জানেন যে বিজেপি মূলতঃ পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার হিন্দু বণিকদের দল। গুজরাতে এই একই ব্যবসায় মুসলীম ধর্মাবলম্বীরা বহুদিন ধরে আছেন এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তিসম্পন্ন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মহাত্মা গান্ধী এবং মহাম্মদ আলি জিন্নাহ গুজরাতের বানিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। জিন্নাহের ঠাকুর্দা ছিলেন গোকুলদাস মেঘজী, একজন হিন্দু, যিনি করাচীতে ব্যবসার জন্য বসবাস শুরু করেছিলেন। গুজরাতিরা দীর্ঘদিনই ব্যবসায়িক উদ্যোগে ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় থেকে এগিয়ে। গুজরাতি বানিয়া সম্প্রদায় তাদের নিজের নিজের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে এই দুই জনকে রাজনীতিতে সমর্থন করেছিলেন । (ইতিহাসের পরিহাসপ্রিয়তা এমনই যে এই দুই ব্যক্তির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিণামে হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক ও আন্তরিক আচরণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত গান্ধী বিবেচিত হলেন অসাম্প্রদায়িক হিসাবে আর সর্বাংশে ধর্মের প্রতি উদাসীন জিন্নাহ নিজেকে পরিচিত করালেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ হিসাবে।) শিশুকাল থেকে আরএসএস এর অনুগামী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন সেখানে নয়। বদরুদ্দিন উমরের কাছ থেকে যে জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা পেতে চাই তা হলো কেন বাংলাদেশ- পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়? ভারতবর্ষের গুজরাত দাঙ্গার কারণে হাজারে হাজারে মানুষ দেশত্যাগ করে পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে যায় নি বা কেউ তেমনটি ভেবেছেন বলেও শোনা যায় নি। উল্টে, প্রশাসনিক কর্তব্য পালন না করার জন্য বৃহত্তর ভারতীয় জনমানসে মোদী ধিকৃত হয়েছেন, হচ্ছেন । তাকে আদালতে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং নির্দোষ প্রমাণ করতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। এমন কি অনেক রাজ্য তাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মোদীর আগমণকে প্রকাশ্যেই অবাঞ্ছিত বলে মন্তব্য করছে। তার প্রশাসনের অধীনস্ত কোন কোন কেন্দ্রিয় ক্যাডারের (আই-এ-এস বা আই-পি-এস) অমুসলিম প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সাক্ষী হয়েছেন। এইসব ঘটনা বৃহত্তর সামাজিক জনমানস নির্মাণে সদর্থক ভূমিকা রাখে। প্রশাসনে এবং সমাজে এই ধরনের মানুষের উপস্থিতি সংখ্যালঘুদের মনে এই আস্থার জন্ম দেয় যে , 'আমি এই দেশেরই, দেশ-সমাজ আমার সাথেই আছে এবং আমার বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।' সে মনে করে না এই দেশ আমার নয়, আমার থাকবার জন্য নয়। মনে করে না 'এই দেশে জন্ম নেওয়াই আমার আজন্মের পাপ'। তাঁর নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তাহীনতা তাকে বাধ্য করে না দেশত্যাগ করতে। অন্ততঃ এইটুকে নির্দ্বিতায় বলা চলে যে ভারতর্ষের তুলনায় বাংলাদেশ বা পাকিস্তানকে তাঁর বেশি নিরাপদ মনে হওয়ার কোন কারণ ঘটে। যদিও পরিস্থিতির অবনমন সময় সময় কিছু অঞ্চলে ঘটতে দেখা যাচ্ছে ।

বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে কি এরকম ঘটছে? দেশভাগের পর থেকে এতবার নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, খলনায়কদের কাউকে কি বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে? কারো শাস্তি হয়েছে? প্রতিবছর একাধিক স্থানে মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটে, বাংলাদেশের

কাগজেই দেখতে পাই। কারোর বিরুদ্ধে কোন সাজা হয়েছে? এমনটি কি ভাবা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গ্রামে-গঞ্জে মাঝে মাঝেই একদল লোক ঢুকে মসজিদ ভেঙ্গে দিচ্ছে? অথবা, মসজিদ ভাঙ্গা বা মসজিদে হামলার মতো খবর কি এতই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে খবরের কাগজে কখনো প্রকাশ হচ্ছে না বা হলেও অত্যন্ত অগুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জায়গায় হচ্ছে? যেমনটা বাংলাদেশে হয়। সেখানে মন্দিরে ঢুকে দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙ্গা যে নিত্যদিনের ঘটনা তা আজকাল সমাজমাধ্যমে জানতে পারা যাচ্ছে। কোন দেশে কোনো সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে হামলা চালানো যদি অতি সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়, তার থেকে অনুমান করা যায় সেই দেশের বিরাজমান বৃহত্তর সামাজিক জনমানসের পরিচয়।

সংবাদপত্রে কতটা গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে তা থেকেই অনুমান করা যায় নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক হামলাতে কেমন এবং কতদূর সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঘটার বাস্তব পরিস্থিতি বিরাজমান। তাকে আর গবেষণা করে নির্মাণ করে নিতে হয় না। রাষ্ট্রই বা কি ভূমিকা নিচ্ছে তার পরিচয়লিপিও সবার কাছে গোপন রাখা যায় না। এইসবের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়াজাত একপ্রকার অসহায়তাবোধ, অনিশ্চয়তাবোধ সকলের অগোচরে নীরবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্রমপ্রসারিত হতে থাকে। এর উপর নির্ভর করে মানুষ জন্মভূমিকে তার জৈবনিক অস্তিত্বের পক্ষে আর কতদূর নিরাপদ মনে করবে। তাদের মনে আস্থা জন্মাতে পারে এমন কিছুই শাসক রাজনৈতিক নেতাদের কথায় বা আচরণে প্রকাশ ঘটে না, বরং কি বাংলাদেশ কি পাকিস্তান, সর্বত্রই কাগজ-পত্রে, দেশনায়কদের ভাষণে এমন যে ঘটছে বা ঘটে তার কোন প্রকাশ্য স্বীকৃতিই পাওয়া যায় না। যা শোনা যায় তা হলো-ত'ইসলাম' শান্তির ধর্ম। এসব হতেই পারে নাত, এই জাতীয় কিছু কথা। অথবা, বদরুদ্দিন উমরের মতো বিশ্লেষণ যেখানে দাবী করা হয় যে সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। এইসব পক্ষান্তরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে হতাশা, অসহায়তা বৃদ্ধি করে আর দুস্কৃতীদের উৎসাহিত করে। বদিরুদ্দিনও তাঁর এই ধরনের অসংবেদনশীল বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ভিত্তি তৈরি করছেন।

আমাদের দেশে বেশ কয়েকবার বৃহদাকার দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু কখনোই আক্রান্ত জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিতে যায় নি। কিন্তু বাংলাদেশ বা পাকিস্থানে কেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের নিরাপদ মনে করেন না এবং ভারতে চলে আসেন তার ব্যাখ্যা বদরুদ্দিন উমরের বিশ্লেষণ দিয়ে করা যাবে না। সেই ব্যাখ্যা অত্যন্ত জলো, অগভীর এবং সাংবাদিকতার তাৎক্ষণিক চটজলদি উত্তরের স্তরে সীমাবদ্ধ। আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ অনেক সময় একেশ্বরবাদী ধর্ম ও তার দর্শন যে মানসিকতার জন্ম দেয় তাকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষের দুইপাশে সাংবিধানিকভাবে ঘোষিত যে দুই নন-সেকুলার ধর্মীয় রাষ্ট্র বিরাজ করছে রাষ্ট্রীয় ধর্মে দেশদুটি মুসলিম, যেখান থেকে অভিবাসন ঘটছে ভারতবর্ষে। যে দুটি দেশ থেকে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের ধর্মের পরিচয়ে একেশ্বরবাদী হওয়ায় এমন যুক্তির বাহ্যিক মান্যতার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ,কেননা ঘটনা এখানে বিপরীতমুখী এবং একেশ্বরবাদী ধর্মজাত দর্শনের আবহ এর একটি কারণ বলে যারা মনে করেন তাদের সেই ব্যাখ্যাকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করায়। মিয়ানমার থেকে বরং যারা ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা ধর্মীয় পরিচয়ে সকলেই মুসলমান এবং যাদের কারণে তাঁরা ঘর ছাড়ছেন তাঁরা ধর্মমতে অহিংসার সাধক।

ফলে কমরেড বদরুদ্দিন উমর, আপনাকে মন্তব্য করার আগে আরো বেশি সংবেদনশীল হতে হবে। মন্তব্য করার আগে ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব ত্যাগ করে নির্মোহ বিশ্লেষণে আত্মমগ্ন হতে হবে। সর্বোপরি মার্কসবাদের নামে অন্ধ জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।

জি এস টি সংস্কার
অবশেষে মোদী পিছু হঠতে বাধ্য হলেন

শুভাশিস মজুমদার

নভেম্বর, ২০১৬ - র নোটবন্দির ঠিক আট মাস বাদে, যে সময়ে আমাদের দেশ ওই তুঘলকি কর্ম কান্ডের আঘাত থেকে সামলে উঠার চেষ্টা করছিল, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তখনো নাজেহাল অবস্থায় ছিল, ঠিক তখনই দেশবাসীর উপর এলো আরো একটি আঘাত। ১ জুলাই ২০১৭র মধ্যরাত্রে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডেকে নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স)। উদ্দেশ্য ছিল একটা রাজ্যের এবং কেন্দ্রের জটিল ট্যাক্স ব্যবস্থাকে সহজ সরল করে 'ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স' ব্যবস্থা চালু করা। ট্যাক্স ফাঁকি আটকানো এবং সহজ ভাবে ব্যবসা করার উপায় হিসেবেও একে বর্ণনা করা হল। সরকারের তরফে বলা হলো এটা ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা। ভারত স্বাধীন হওয়ার দিনে পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর সংসদে সেন্ট্রাল হলে দেওয়া মধ্যরাত্রের ভাষণের অনুকরণে নরেন্দ্র মোদী এই জি এস টি সূচনার আয়োজন করেন।

জিএসটি চালু করার প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সরকার একটি বা দুটি ট্যাক্সের বদলে ৫,১২,১৮,২৮ শতাংশ এই চার প্রকারের ট্যাক্স এবং তার সাথে নানা ধরনের সেস যুক্ত করে আর একইসঙ্গে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, আউটপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়া সংযোগে পুরো ব্যবস্থাটাকে আরো জটিলতর করে তোলে। সদ্য নোট

বন্দির ধাক্কা খাওয়া ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা নতুন এই জিএসটি ব্যবস্থাকে মান্যতা দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন। অচিরেই ৭৫ হাজারেরও বেশি মাইক্রো,স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এর নাম দিলেন গব্বর সিং ট্যাক্স। সত্তর দশকের জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা শোলে-র ডাকাত গব্বর সিং যেমন গ্রামবাসীর উপর লুটপাট চালাতো, তারই সঙ্গে তুলনা। সরকারের এই কাজের তীব্র সমালোচনা হলেও সরকার এটাকে মোদীজির মাস্টার্স স্ট্রোক হিসেবেই বর্ণনা করে এবং বলে কিছু অসুবিধে প্রথম দিকে হলেও পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সরকারের দীর্ঘদিন ধরে এই আড়াল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ৮ বছর বাদে, এখন 'নেক্সট জেন জিএসটি রিফর্ম' নামে জিএসটি ব্যবস্থার পরিমার্জন করা হয়েছে। অর্থাৎ মেনে নেওয়া হল এতদিন যা চলেছে তা ঠিক ছিল না। পূর্বের চার প্রকারের ট্যাক্স ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে ৫ এবং ১৮ শতাংশ এই দুই প্রকার ট্যাক্স চালু করা হলো। ২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, থেকে এটা কার্যকর হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ২০১৭-র জি এস টি ব্যবস্থা যদি ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা হয়, তাহলে ২০২৫-র এই জি এস টি রিফর্ম কি ভারতের তৃতীয় স্বাধীনতা?

গদি মিডিয়া একে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে দেয়া দিওয়ালি গিফট বোনানজা হিসেবে বর্ণনা করছে। সরকার বলছে , ব্যক্তিগত জীবন বীমা বা স্বাস্থ্য বীমার উপর ট্যাক্স শূন্য করে এবং বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ট্যাক্স কমিয়ে অথবা শূন্য করে সাধারণ মানুষকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি ঘুরিয়ে সরকার স্বীকার করে নিচ্ছে যে গত আট বছর ধরে উচ্চ হারে ট্যাক্স চাপিয়ে সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষিত করা হচ্ছিল! উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পঠন-পাঠনের ন্যূনতম সামগ্রী যেমন পেন্সিল, পেন, ইরেজার, নোট বুক ইত্যাদির উপর ১২ শতাংশ জিএসটি ধার্য ছিল, যা এখন সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে শূন্য করা হয়েছে। জীবন দায়ী (লাইফ সেভিং) ওষুধ বা ৩৩ প্রকার কঠিন অসুখ (ক্রিটিক্যাল ডিজিজ) এর ওষুধের জি এস টি পূর্বের বারো শতাংশ থেকে তুলে দিয়ে শূন্য করা হয়েছে। টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, ছোট গাড়ি, টু হুইলার প্রভৃতির ট্যাক্স অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে

জি এস টি রিফর্ম এর জন্য সরকারের প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা জি এস টি কম আয় হবে। যদিও সরকার একে ক্ষতি বলতে নারাজ। তাদের মতে, জিনিস পত্রের দাম কমলে বাজারে বিক্রি বাড়বে। ফলে উৎপাদন বাড়বে। কাঁচামাল বেশি বিক্রি হবে। এতে কর্ম সংস্থান হবে, আর ঘুরে ফিরে ট্যাক্স আদায়ও বাড়বে। এই কথাই তো রাহুল গান্ধি বলে আসছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ট্যাক্স রিফর্ম এর ফলে বাজারে প্রায় দু লক্ষ কোটি টাকার কেনা বেচা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সীমাহীন বেরোজগারি, উপার্জন বৃদ্ধি না পাওয়া, বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কোমর ভেঙে দিয়েছে। এই রিফর্ম কিছুটা হলেও তার থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার উপায় হতে পারে। কিন্তু এই দাম কমার সুফল সত্যি সাধারণ মানুষ পাবে, নাকি কর্পোরেট হাউস মাঝখান থেকে তাদের লভ্যাংশ বাড়িয়ে নেবে, তাই নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কর্পোরেট হাউস বা ইন্ডাস্ট্রি হাউজ গুলিকে বাণিজ্যমন্ত্রী পিযুষ গয়ালের নির্দেশ সত্বেও এই সংশয় দুর হওয়ার নয়। বিশেষত এই মুহূর্তে সরকারের হাতে বাজার দরকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো আইন নেই। বীমা কোম্পানি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ফেরত না পেলে (জি এস টি শূন্য হলে) প্রিমিয়াম বাড়তে পারে।

ট্যাক্স আদায় ঘাটতি কমানোর জন্য একটা বিশেষ 40% ট্যাক্স দর করা হয়েছে। এই ট্যাক্স দরে পান মশলা, বিড়ি, সিগারেট, তামাকজাত পণ্য, সধ ড্রিঙ্কস (সিন ট্যাক্স বা পাপ কর) এবং দামী শৌখিন (লাক্সুরিয়াস) পণ্য (হেলিকপ্টার, জলযান, বিমান প্রভৃতি) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনলাইন লটারি, হর্স রেসিং, বেটিং, আই পি এল টিকিট ইত্যাদিতেও 40% ট্যাক্স লাগু হচ্ছে।

বিরোধীদল গুলি, বিশেষতঃ কংগ্রেসের ৮ বছরের তীব্র বিরোধিতার পরে মোদী সরকারের হঠাৎ এই পদক্ষেপ কেন? সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করে, মাত্র ৬ মাসের মধ্যে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যাওয়ার লক্ষ্য অবশ্যই বিজেপির আছে। আর আছে, ট্রাম্পের চড়া হারে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক বসানোর প্রভাবকে নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্য। নিজেদের দেশে পণ্যের বিক্রি বাড়লে উৎপাদন ঠিক রেখে আমেরিকার উপর নির্ভরতা কমানো যেতে পারে। যদিও সরকার তা' স্বীকার করেছে না।

নোটবন্দি, গব্বর সিং ট্যাক্স (জি এস টি) নিয়ে রাহুল গান্ধির লাগাতার সরকারকে আক্রমণ এবং বিজেপির (পড়ুন মোদীর) বিরুদ্ধে ভোট চুরির ইস্যুতে রাহুল গান্ধির জোরদার প্রতিবাদ আন্দোলনের চাপে সরকার এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হল।

তবে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুডের দাম ব্যারেল পিছু ৬০-৬৫ ডলার নেমে এলেও পেট্রোল ডিজেল এখনো প্রতি লিটার ১০০ টাকার উপরে বিক্রি হচ্ছে চড়া হারে ট্যাক্সের কারণে। ড মনমোহন সিংয়ের সময় ক্রুড প্রতি ব্যারেল ১৪০ টাকা পৌঁছে গেলেও পেট্রোল ডিজেল ৬০-৬৫ টাকা প্রতি লিটার বিক্রি হত। তখন এলপিজি ছিল ৪০০ টাকা প্রতি সিলিন্ডার, যা এখন ১২০০ টাকা ঘুরে এসে ৯০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

মোদী সরকার পরিকাঠামো (ইনফ্রাস্ট্রাকচার) তৈরির নামে চড়া হারে পেট্রোপণ্যের উপর ট্যাক্স আদায় করে গেলেও, দেশ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ব্রিজ ভেঙে পড়া, পাহাড়ে ধ্বসনামা ও ভয়ঙ্কর বন্যার পরিস্থিতি দেখিয়ে দেয় এর অন্তঃসার শূন্যতা।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে : ওমর খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ

অমিতাভ সিংহ

'বেল ইজ দ্য রুল অ্যান্ড জেল ইজ দ্য এক্সেপসন' অর্থাৎ 'জামিন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কারাবাস ব্যতিক্রম ' বিচারপতি আয়ারের এই দৃষ্টিভঙ্গি আবারও প্রত্যাখ্যাত হল ওমর খালিদ,সার্জিল ইসলামসহ সাতজন বিচারাধীন বন্দীর জামিন আবেদন সম্প্রতি দিল্লী হাইকোর্টের বক্তব্যে। জেল নয় জামিন এটাই আইনের সাধারণ নীতি। কিন্তু দিল্লী হাইকোর্টের দুই বিচারপতি নবীন চাওলা ও শৈলেন্দ্র কৌরের ডিভিশন বেঞ্চ তা মানলেননা। কেনো তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন তা বোঝা কঠিন। বিচারকরা এই সাতজন বন্দী যারা পাঁচ বছর ধরে কারাবাসে রয়েছেন তাঁদের জামিনের আবেদন বাতিল করে দিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা এটাই যে এই পাঁচ বছরে তদন্তের হাল অতীব হতাশাজনক। তদন্ত আদৌ এগোয় নি। এইভাবে বিচার প্রক্রিয়াকে বছরের পর বছর দীর্ঘ করে সাতজন উজ্জ্বল মেধাবী যুবক, সেলিম খান,শিফাউর রহমান,আথার খান,শাদাব আহমেদ,আধুল খালিদ সাইনি,শালফিশা ফতিমা,সার্জিল ইসলাম ও ওমর খালিদকে দিনের পর দিন বিনাবিচারে কেনো জেলবন্দি করে রেখেছে সরকার ? উদ্দেশ্য কী এই সরকারের ?সমাজের কাছে কী উদাহরণ স্থাপন করছেন তাঁরা? তাঁরা কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে ও সরকার বিরোধীদের ভয় দেখাচ্ছেন ?

গত ২ সেপ্টেম্বরের রায়ে আদালত স্বীকার করেছে বিচার বিলম্বিত হওয়া ও দীর্ঘকাল জেলে থাকা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। দ্রুত বিচারের অধিকার সংবিধানের ২১ তম অনুচ্ছেদ থেকে প্রভাবিত মৌলিক অধিকার। তাসত্বেও আদালত যুক্তি দিয়েছে দীর্ঘ কারাবাস বা বিচারপ্রক্রিয়ার দেরী কখনও জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে সার্বজনীন নিয়ম হিসাবে প্রযোজ্য হতে পারে না।প্রতিটি মামলার বিশেষ পরিস্থিতি ও তথ্য অনুযায়ী আদালতের স্বাধীনতা থাকবে জামিন মন্জুর বা অস্বীকার করার।

ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম কে এ নাজিব মামলায় (২০২১) সুপ্রীম কোর্ট বলেছিল ইউ এ পি এ 'র ৪০ডি(জে) ধারার মতো কঠোর বিধান সাংবিধানিক আদালতের হাতে থাকা মৌলিক অধিকারকে খর্ব করতে পারে না। বিচারপতিরা মত দেন বিশেষ আইন যেমন কোন জামিনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে তেমনই দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া ও অযৌক্তিক কারাবাসের প্রেক্ষিতে সাংবিধানিক আদালতের দায়িত্ব মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানায় শুরুতে আইন অনুযায়ী জামিনে কড়াকড়ি মেনে চলা স্বাভাবিক, কিন্তু বিচারে কোন গতি যদি না থাকে ও অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই সাজা হিসাবে নির্ধারিত শাস্তির বড় অংশ ভোগ করে ফেলেছে তখন কঠোর আইন নমনীয় হতে বাধ্য। এখানেই ' বেল ইজ দ্য রুল আন্ড জেল ইজ এক্সেপসন ' নীতি প্রযোজ্য হওয়া স্বাভাবিক জ্জ এই বিচার প্রক্রিয়া দিল্লী হাইকোর্টের বেঞ্চ অনুসরণ করল না।

গত বছর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এ এস ওঝা তার পর্যবেক্ষণে বলেন যদি আদালত যোগ্য মামলায় জামিন না দেয় তাহলে তা সংবিধানের ২১তম অনুচ্ছেদ লংঘন করা হবে। আবার নবাল কাপুর বনান এনআইএ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানায় শুধু অপরাধ গুরুতর বলেই জামিন আটকে রাখা যায় না। সেক্ষেত্রে দ্রুত বিচার শেষ করাই জরুরি।

সাম্প্রতিককালে ইউএপিএতে অভিযুক্ত বেশ কয়েকজন সুপ্রীম কোর্টে জামিন পেয়েছেন। ভীমা কোরেগাও মামলায় ভারভারা রাও বা অধ্যাপক সাইবাবা জামিন পেলেও আনন্দ তেলতুম্বে বা সুধা ভরদ্বাজের কপাল খোলেনি। গত বছর অগস্টে সুপ্রীম কোর্ট এও বলেছে যে ইউএপিএ তে মামলা হলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করা উচিত।

ওমর খালিদরা কেন বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার জেরে বিচারহীন অবস্থায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরেও কেন জামিন পাবেন না এই প্রশ্নের উত্তর কেন রাষ্ট্র দিতে পারবে না? একজন মেধাবী যুবক কেন তার যৌবনকালে দেশের সেবা করতে পারবে না ? এর বিচার কে করবে? গণতান্ত্রিক দেশে কোনও নাগরিককে এভাবে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লঙ্ঘন শুধু তাই নয়, তা সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল ১৯ এ বর্ণিত নাগরিকের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন।

কিন্তু এই সাতজন মেধাবী যুবকের অপরাধটা কি?

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে কমবেশী প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল ২০২০ সালে। দেশের বিভিন্ন মেধাবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীরা সব চাইতে বেশি সংখ্যায় এই প্রতিবাদে শামিল হয়। পূর্ব দিল্লীতে একই রকমভাবে প্রতিবাদ চলছিল। বিজেপির অনুরাগ ঠাকুর,কপিল মিশ্র প্রমূখ নেতারা সেখানে উত্তেজক ভাষন দেন। বলেন গুলি মারো শালেকো। এই দাঙ্গার ফলে ৫৩ জনের প্রাণহানি ও অন্তত ৭০০ জন আহত হন। ওমর খালিদেরা সবসময় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কথা বলেছিলেন।

গান্ধিজি প্রদর্শিত পথে। কিন্তু দিল্লি পুলিশ বিজেপির নেতাদের গ্রেপ্তার না করে ওমর খালিদের বিরুদ্ধে উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগ করে ও দিল্লি দাঙ্গার দায় এঁদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ইউএপিএ সহ একাধিক ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০২০ সাল থেকে তাঁরা বিনাবিচারে জেলবন্দী। আর ধর্ষণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামী রাম রহিম বা আশারাম বাপু জেলের বাইরে ইচ্ছা অনুযায়ী বিচরণ করছে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ককে স্ফীত করতে।

সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি ভূষন রামকৃষ্ণ গাভাই দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছিলেন আমি সরকার পক্ষ বা সরকার বিরোধী তা দেখব না,সেভাবে বিচার দেব না। দেশের সংবিধান অনুযায়ী বিচার পাবেন অভিযুক্ত নাগরিকেরা। বি আর আম্বেদকার সাবধান করেছিলেন যদি শোষণ, অবিচার, নির্মমতা নেমে আসে দরিদ্র, দলিত, সংখ্যালঘু বা আদিবাসীদের মধ্যে বা তাদের সাংবিধানিক কাজ করতে বাধা দেওয়া হয় তখন যে ক্ষোভ জন্মাবে তখন তাদের গ্রেপ্তার না করে তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে। এটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। বর্তমান বিজেপি সরকার এই নীতি থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে তো বটেই,তারা বিচারবিভাগকেও বাধ্য করতে চাইছে একই নীতি অনুসরণ করতে। কোনও কোনও বিচারপতি সরকারের বয়ানের ফাঁক নিজ উদ্যোগে পূরণ করতে চাইছেন। এই অবস্থা দেশের পরিপক্ক গণতন্ত্রে কাম্য হতে পারে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে
রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভূমিকা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ ও আর. এস. এস.

১৯২৯ সালে লাহৌর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।সিদ্ধান্ত হয় ২৬ জানুয়ারি তারিখটি প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসরূপে পালিত হবে।ওই দিন দেশব্যাপী সভা সমাবেশ হবে। সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।সাফাই, সূত্রযজ্ঞ ,অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচি পালিত হবে।আর.এস.এস প্রধান ডাক্তার সাহেব জানান আর.এস.এস এই কর্মসূচিতে যোগ দেবে না।তবে ব্যাক্তিগতভাবে সংঘের কোনও সদস্য চাইলে নিজ বাড়িতে ওই ভাগোয়া ঝানডা তুলতেপারেন,তেরঙ্গা পতাকা নয়।২৬ জানুয়ারিতারিখটিবর্তমানেপ্রজাতন্ত্র দিবসরূপেপালিতহয়।পরাধীন ভারতে ওই দিনটি পালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে দমন পীড়ন সহ্য করতে হত।

১৯৩০-১৯৩১ লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ এর আইন অমান্য আন্দোলনে সংঘ পরিবার যোগ দেবেনা বলে ডাক্তার সাহেব জানিয়ে দিয়েছিলেন।তবে তিনি বলেন কোনও সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে চাইলে এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন।আর.এস.এস এর ইতিহাসকার সি.পি.ভিসিকার লিখেছেন ডাক্তার সাহেব হিন্দুদের ও হিন্দু সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য বলেছেন, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনসম্পর্কে তিনি বরাবরই নীরব ছিলেন। ১৯৩৪ সালে সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে তিনি হিটলার ও মুসোলিনির পথ অনুসরণ করার কথা বলেন।ডা.মুনজে তাঁকে সমর্থন করেন।

১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের প্রবীণ গান্ধিবাদী নেতা যমুনালাল বাজাজ ডা.হেডগেওয়ারের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নে সংঘের কি মনোভাব তা জানতে চান। ডাক্তার সাহেব অবশ্য যমুনালালজির সঙ্গে দেখা করে তাদের সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উঠেছিল ও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তার দুর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে একটিপ্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস সদস্যদের হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ ও আর.এস.এস-এর সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করে।কারণ এই ৩ টি সংগঠনই ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছিল।

বাংলার গুপ্ত বিপ্লববাদী আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ তাঁর ' জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা ' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ও বাংলার বিপ্লববাদী আন্দোলনের বিরাট সংখ্যক সংগঠক ১৯৩৯ সালে গান্ধিজির হস্তক্ষেপে জেল থেকে মুক্তি পান ও পুনরায় আত্মগোপন করেন। গান্ধিজি তাঁদের বলেছিলেন তিনি শীঘ্রই চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দেবেন।মহারাজ তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে নাগপুরে এসে উপস্থিত হন। এখানেই সংঘের সদর দপ্তর।কলকাতায় মহারাজের এক সম্পর্কিত ভাই ছিলেন ডা.হেডগেওয়াড়ের সহপাঠী। তখন ডাক্তার সাহেব তাঁর সঙ্গে মাঝে মধ্যে অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রে আসতেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে খুবই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন।কিন্তু তিনি মহারাজকে জানিয়ে দেন যে ব্রিটিশ বিরোধী কোনো সংগ্রামে আর.এস. এস যোগ দেবে না।

মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর

সংঘের জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেন দ্বিতীয় সরসংঘ চালক মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর। ইনি ১৯৩৮ সালে বলেন-- ' হিন্দুস্তানের অ-হিন্দু মানুষদের দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয় তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে মেনে নেবেন,হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করবেন, হিন্দুকে মর্যাদা দেবেন ও শ্রদ্ধা করবেন, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির গরবকীর্তন ছাড়া অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না.....এক কথায় তাঁদের বিদেশি হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে।অন্যথায় তাঁরা এদেশে থেকে যেতে পারেন,কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হিন্দুজাতির অধীন হয়ে।কোনও কিছুর ওপর কোনও দাবি থাকবেনা তাঁদের, থাকবে না কোনও বিশেষ অধিকার।কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা---এমনকী নাগরিক অধিকারও না(We– or Our Nation Defined–pp.55-6 by M.(Golwalkar ---1938—Nagpur Bharat Prakashan.)'।

১৯৪০ সালে ডাক্তার সাহেবের প্রয়াণের পর তিনিই সংঘ প্রধান হন। তাঁকে সংঘের সদস্যরা ' পূজনীয় গুরুজি ' বলে উল্লেখ করে থাকেন । আগস্ট আন্দোলনের সময় গুরুজি সাফল্যের সঙ্গে সংঘের স্বয়ং সেবকরা যাতে কোনো ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলনে যোগ না দেন সে বিষয়ে নজর রেখেছিলেন। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে তাদের রিপোর্টে বলছে ' আর.এস.এস ও হিন্দু মহাসভা কোনও রকম আন্দোলনে যোগ দেয়নি।তারা আইন মেনে চলছে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।'আগস্ট আন্দোলনের সময় ১৯৪৩ সালে (বাংলা সন ১৩৫০) বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে গোলওয়ালকর যা বলেন তা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। তিনিবলেছিলেন-- 'এই দুর্ভিক্ষ ও তার পরিণতির জন্য সংঘ কাউকে দায়ী করতে চায়না।যখন জনসাধারণ এই সব ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করতে চায় তখন তাদের যে দুর্বলতা আছেতা ফুটেওঠে। দুর্বলের প্রতি সবলের যে অবিচার তারজন্য সরকাব কেদায়ী করার কোনও অর্থ হয়না। এটি একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সংঘ (আরএসএস) অন্যদের(পড়ুন ব্রিটিশ সরকার) সমালোচনা করে তাদের মূল্যবান সময় নস্ট করতে চায় না। আমরা যদি জেনে থাকিযে প্রকৃতির রাজ্যে এটাই নিয়মযেবড় মাছ ছোট মাছকে খাবে,তখন বড়মাছের ওপর দোষ চাপানো একরকম বাতুলতা। প্রকৃতির নিয়ম (Law of Nature)তা ভালো খারাপ যাই হোকতা সবযুগেই সত্য। এই নিয়মকে বেঠিক (Unjust) বলে পরিবর্তন করা যায়না।' মজুতদার,কালোবাজারি ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে এই ছিল গোলওয়ালকর ও সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধিজির হত্যাকাণ্ডের (৩০জানুয়ারি, ১৯৪৮)মধ্যের সময়ে গান্ধীজির সঙ্গে গোলওয়ালকরের দুবার সাক্ষাৎ হয়। সেপ্টেম্বরে দিল্লিতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। গান্ধিজি ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা থেকে দিল্লীতে আসেন। গোলওয়ালকর ১২ তারিখ গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন।ওই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বহুদিন পর ১৯৬৯ সালে গান্ধিজির জন্ম শতবার্ষিকীর সময় গোলওয়ালকর বলেন 'সেই সময় (১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর) দিল্লীতে দাঙ্গা হচ্ছিল। গান্ধিজি আমায় বললেন'দেখো কী হচ্ছে'। আমিবললাম'এ আমাদের দূর্ভাগ্য। বৃটিশরা বলেযে আমরা যখন থাকবোনা, চলে যাবো তখনতোমরা পরস্পরের গলার নলি কাটবে। আজতাই হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আমাদেরসুনামনষ্ট হচ্ছে।' সেদিনের বিকালের প্রার্থনা সভায় গান্ধিজি গর্বের সঙ্গে আমার নাম নেন ও আমার চিন্তার কথাবলেন।'

গোলওয়ালকরের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে প্রকৃত ভাষ্য কী ? গান্ধিজি ও সর্দার প্যাটেলের জীবনীকার রাজমোহন গান্ধি ওই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি, গান্ধিজি ওই দিন ১২/০৯/১৯৪৭ এ বিকালের প্রার্থনা সভায় নিজে কী বলেছিলেন তা ' হরিজন ' পত্রিকার ২১ সেপ্টেম্বর,১৯৪৭ সংখ্যা থেকে হুবহু তুলে দিয়েছিলেন। গান্ধিজি বলেন ' আমি তাঁকে (গোলওয়ালকর) বলেছি ' আর এস এস-এর হাত রক্তরঞ্জিত । গুরুজি আমায় বলেছেন 'একথা সত্য নয় ।তার সংগঠন মুসলমানদের হত্যা করার পক্ষে নয়। তারা সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে চায়। তারা শান্তির পক্ষে এবং সে আমাকে (গান্ধিজিকে) বলেছে আমি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারি ।ক্ষ্ম গান্ধিজি তাঁকে বলেছিলেন, এই বিবৃতি তোমার পক্ষ থেকেই দেওয়া উচিৎ ।'

রাজমোহন গান্ধি উপরোক্ত বিষয়ে আরও একজনের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ব্রিজকৃষ্ণ চান্ডিওয়ালা। ইনি দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ করেন। তারপর থেকেই সে গান্ধিজির ছায়াসঙ্গী। কৃষ্ণ লিখেছেন, যখন গোলওয়ালকর বাপুকে বলেন, আর এস এস মুসলমানদের হত্যা করার পক্ষে নয়, বাপু তাঁকে বলেন, 'একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর।' গোলওয়ালকর বাপুকে বলেন, 'আপনি আমার নাম উল্লেখ করে একথা বলতে পারেন।' বাপু তাঁকে বলেন, 'এই বিবৃতি তোমার পক্ষ থেকেই দেওয়া উচিত ।ক্ষ্ম গান্ধিজি নিহত হবার পর আর এস এসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় । ১৯৪৮-এর ২৭ অক্টোবর নেহরু প্যাটেলকে লেখেন, সেই সময় বাপু তাঁকে বলেছিলেন তিনি গোলওয়ালকরের কথায় বিশ্বাস করেন না।

গান্ধিজি ওই আলোচনার চারদিন পর ১৬ সেপ্টেম্বর,১৯৪৭-এ দিল্লির বাল্মীকি কলোনিতে আর এস এস-এর কর্মীদের এক সভায় ভাষণ নেন।এই মিটিংটি সম্পর্কে 'হরিজন' পত্রিকায় ও গান্ধিজির সচিব প্যারেলাল নায়ার লিখিত 'দি লাস্ট ফেজ' এবং ব্রিজকৃষ্ণের ডায়েরিতে যা পাওয়া গিয়েছে তা এইরকম -- গান্ধিজি আর এস এস কর্মীদের বলেন, 'অনেক বছর আগে আমি আর এস এস-এর শিবির পরিদর্শন করে তাদের শৃঙ্খলা, জীবনযাত্রার সারল্য ও অস্পৃশ্যতার অনুপস্থিতি দেখে খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু মনোভাবের মধ্যে শুদ্ধতা ও প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া আত্মত্যাগ সমাজের ঐক্য রক্ষার জন্য সহায়ক তা প্রমাণ করতে হয়। একজন সংঘ কর্মী প্রশ্ন করেন, 'হিন্দুধর্ম কি একজন খারাপ কাজ করেছে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা অনুমোদন করে না।' উত্তর গান্ধিজি বলেন, 'একজন পাপী ব্যক্তি কী করে আরেকজন পাপীকে বিচার বা হত্যা করার অধিকার দাবি করে।' গান্ধিজি বলেন, সঠিক পদ্ধতিতে গঠিত কোনও সরকারই কেবল আইন অনুযায়ী পাপীর বিচার করতে পারে। তিনি নেহরু ও প্যাটেল সম্পর্কে বলেন, ক্ষ্ম এঁরা দুজনেই দীর্ঘ দিনের সহকর্মী ও তাদের লক্ষ্য এক। তোমরা যদি নিজেদের হাতে আইন ও বিচার ও শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নাও তাহলে তো তারা ক্ষমতাহীন ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। নিজেদের হাতে ক্ষমতা ও আইন তুলে নিয়ে এইভাবে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি কোরো না।' তিনি মনে করিয়ে দেন হিন্দুধর্ম ' বর্জন '

করার ধর্ম নয়।এই ধর্ম সকলকে গ্রহণ করার কথা বলে।ক্ষ্ম এরপর গান্ধিজি যা বলেন তা আজকের দিনেও প্রযোজ্য। তিনি বলেন ' বিরাট সংখ্যক হিন্দু যদি ভুল পথে পরিচালিত হয় তাহলে কেউই হয়তো তাদের নিবৃত্ত করতে পারবেনা।কিন্তু তাও একজন ব্যক্তিরও অধিকার আছে এর বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করার। যা আমি এখন করছি।'

সেপ্টেম্বর থেকে (১৯৪৭) আর এস-এর পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন সভা সমাবেশে উত্তেজনাপূর্ণ সম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রচার করা হয়। একই সঙ্গে প্রচার চালানো হয় মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে। এদের মুখপত্র Organiser-এ গান্ধিজি সম্পর্কে বলা হয় তিনি রোম সম্রাট নীরো। যখন রোম জ্বলছিল তখন সম্রাট নীরো বীণা বাজাচ্ছিলেন। গান্ধিজি যখন হিন্দুরা আক্রান্ত তখন শান্তির বাণী বর্ষণ করছেন। গান্ধিজি তাঁর কলকাতা অবস্থানের (আগস্ট ১০ -সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ পর্যন্ত , ১৯৪৭) সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়।

ডিসেম্বরের ৭ তারিখ দিল্লি রামলীলা ময়দানে আর এস এস-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে গোলওয়ালকর আবার দীর্ঘ জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি সংঘের শক্তি কীভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে আত্মপ্রশস্তিমূলক বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সংঘের শক্তি দেখে সবাই বিস্মিত হচ্ছে। পরের দিন সন্ধ্যায় রোটক রোডে দুহাজার নেতৃস্থানীয় আর এস এস ক্যাডারের সভায় গোলওয়ালকর বলেন, 'আমাদের ছত্রপতি শিবাজীর মতন গেরিলা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তানকে শেষ করা হচ্ছে আমাদের থামানো যাবে না। নেহরু সরকার আমাদের ঠেকাতে পারবে না।' ওই সভা সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট বলছে গোলওয়ালকর বলেন, 'পৃথিবীতে কোনও শক্তি নেই যারা মুসলমানদের ভারতে রাখতে পারে। তাদের এই দেশ ছাড়তে হবে। মহাত্মা গান্ধি ভোটের জন্য মুসলমানদের এদেশে রাখতে চান।কিন্তু নির্বাচনের আগেই তাদের এই দেশ ছাড়তে হবে।মহাত্মা গান্ধি আর তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। সরসংঘচালক গুরুজি জানিয়ে দেন যে,আমাদের হাতে এমন মাধ্যম আছে যার দ্বারা এই ধরনের লোকদের অবিলম্বে নিশ্চুপ করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য হিন্দুদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন না হওয়া। তবে যদি আমরা বাধ্য হই, তাহলে আমরা সেই পথ গ্রহণ করতেও পিছপা হব না।' (কর্তার সিং ইন্সপক্টের, সিলাইডি-র রিপোর্ট। ৭-৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।

দিল্লিতে ১৯৪৭-এর দ্বিতীয়ার্ধে এক কুৎসিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। পাঞ্জাবের দাঙ্গা, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের এপারে আসা, তাদের মর্মন্তুদ কাহিনীকে একতরফা প্রচারের কাজে লাগিয়ে সংঘের বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচার, পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে গোলওয়ালকর ও আর এস এস মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরু যারা এই দেশকে একটি ধর্মান্ধ হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন তাদের 'অবিলম্বে নিশ্চুপ করে দেওয়া'র কথা চিন্তা করেছিল। এরপর ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারি কী হয়েছিল সকলেই জানেন। এই হচ্ছে হিন্দুত্ববাদি আরএসএস - এর স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান। (ক্রমশ)

আইন আর আদালতের গেরোয় ওয়াকফ সম্পত্তি

মজিবুর রহমান

২০২৪ সালের ৮ই আগস্ট কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু লোকসভায় ওয়াকফ সম্পর্কিত একটি বিল উত্থাপন করেন। বিরোধী দলের সাংসদরা বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এটি পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি জানান। পরের দিনই লোকসভার ২১ ও রাজ্যসভার ১০ মোট ৩১ জন সাংসদকে নিয়ে একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান হন উত্তর প্রদেশের বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল। কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ২২শে আগস্ট। জনগণকে বিলটির ব্যাপারে ২৯শে আগস্ট থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মতামত নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়। জেপিসি ২৫টি সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট জমা দেয়। ২০২৫ সালের ৩রা এপ্রিল লোকসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে ভোটাভুটি হয়। বিলটির পক্ষে ২৮৮টি আর বিপক্ষে ২৩২টি ভোট পড়ে। ৪ঠা এপ্রিল রাজ্যসভায় ১২৮-৯৫ ভোটে বিলটি পাস হয়। ৫ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়। আইনটির পোশাকি নাম 'একীভূত ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতায়ন, দক্ষতা ও উন্নয়ন আইন, ১৯৯৫'। ইংরেজিতে 'ইউনিফাইড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এম্পাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৫'।

সার্বিক সহমতের ভিত্তিতে নয়, সংখ্যার জোরে তৈরি নতুন ওয়াকফ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজনীতিবিদ, নাগরিক সংগঠন এবং আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অন্তত ৬৫টি আবেদন জমা পড়ে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া মজলিস ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন-এর সাংসদ ব্যারিস্টার আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি, জমিয়াত উলামা ই হিন্দ-এর শীর্ষ নেতা আরশাদ মাদানি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ ইমরান মাসুদ ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সাংসদ মনোজ কুমার ঝা। আইনটির বিরুদ্ধে আদালতের বাইরে রাজপথেও আন্দোলন হয়। কোথাও কোথাও আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এরূপ একটি এলাকা হল মুর্শিদাবাদ জেলার

সামশেরগঞ্জ। অন্যদিকে, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও আসাম প্রভৃতি কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্য আইনটির প্রতি তাদের সমর্থনের কথা আদালতকে জানায়। এপ্রিল-মে মাসে একাধিকবার শুনানির শেষে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে আইনটির বাস্তবায়ন বন্ধ রাখা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর আরেকটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ-এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সংশোধনী আইনটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার ওপর স্থগিতাদেশ দেয়।মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে।

ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্প্রদান করাকে ওয়াকফ বলা হয়। এই অনুদানকে মুশরুত উল খিদমত এবং যিনি এই দান করেন তাঁকে ওয়াকিফ বলা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয় মুতাওয়াল্লি। ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা বিক্রি করা যায় না। জমি জায়গা, ঘরবাড়ি, টাকা পয়সা প্রভৃতি যেকোনো জিনিসই ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ওয়াকফ সম্পত্তিতে নির্মিত ও পরিচালিত হয় মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, মাজার, স্কুল, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, ইয়াতিমখানা, মুসাফিরখানা, ইমামবাড়া, দালানকোঠা, কবরস্থান, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, দোকান, কৃষিজমি, পুকুর প্রভৃতি। ওয়াকফ তহবিল থেকে প্রদান করা হয় ইমাম, মোয়াজ্জিনদের ভাতা। দুস্থ, মেধাবী পড়ুয়া এবং পীড়িত, প্রতিবন্ধী মুসলিমদের আর্থিক সহায়তা করার সংস্থানও রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম পালন ও প্রচার এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে বেশকিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওয়াকফ ব্যবস্থা সংযুক্ত। ওয়াকফের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন সময়ে ভারতের মুসলিম সম্রাট, সুলতান, নবাব, জমিদাররা তাঁদের প্রভূত সম্পত্তি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে দান করে গেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে। মুহাম্মদ ঘুরি (১১৪৪-১২০৬) ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠার পর দুটি গ্রাম ওয়াকফ হিসেবে দান করেন। শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১১৮০-১২৩৬), আলাউদ্দিন খিলজি (১২৬৬-১৩১৬) ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১২৯০-১৩৫১) প্রমুখ মুসলিম শাসকরা ওয়াকফ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৮৫৭) সময় ওয়াকফ ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটে। বিশ্ববিখ্যাত সৌধ তাজমহল একটি ওয়াকফ সম্পত্তি। বাংলার প্রখ্যাত দানবীর অকৃতদার হাজী মুহাম্মদ মহসিন (১৭৩০-১৮১২) তাঁর বিপুল সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। এখনও বিত্তশালী মুসলমানরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করে চলেছেন। এর ফলে, ভারতে বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে।

মার্চ, ২০২৫-এর একটি হিসাব অনুযায়ী, এখন ৩৮ লক্ষ একরের বেশি এলাকা জুড়ে ৮ লক্ষ ৭২ হাজারের বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি ছড়িয়ে রয়েছে। ২০০৬ সালে সাচার কমিটি ওয়াকফ সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির মধ্যে বেশি পরিমাণে রয়েছে কবরস্থান (17%), কৃষিজমি (16%), মসজিদ (14%) এবং দোকান (13%)। ওয়াকফ সম্পত্তি বিদ্যমানতার নিরিখে ভারতের প্রথম তিনটি রাজ্য হল উত্তর প্রদেশ (27%), পশ্চিমবঙ্গ (10%) ও পাঞ্জাব (9%)। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮০ হাজার এবং এলাকার পরিমাণ ৮২ হাজার একর। এরাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর রয়েছে ১৫৮টি স্কুল, ৪টি মডেল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, ১৯টি মুসলিম হোস্টেল, ৯টি হাসপাতাল এবং ১টি শপিং কমপ্লেক্স। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, রেল ও প্রতিরক্ষা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য যেকোনো দপ্তরের ভূসম্পত্তির থেকে ওয়াকফ ল্যান্ডের পরিমাণ বেশি। শুধু তাই নয়, ভারতে যত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশেও তত ওয়াকফ সম্পত্তি নেই। প্রসঙ্গত, মুসলিম সমাজের ওয়াকফ সম্পত্তির মতোই হিন্দু সমাজে রয়েছে 'দেবোত্তর সম্পত্তি'। মঠ, মন্দির, টোল, শ্মশান এবং নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এসব রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতে কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার ভার সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্টের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে রচিত ধর্মীয় সম্পত্তি আইন আজও প্রায় একই রয়ে গেছে। মুসলিম ওয়াকফ ব্যবস্থাকে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯১৩, ১৯২৩ এবং ১৯৩১ সালে ওয়াকফ আইন তৈরি করা হয়। স্বাধীন ভারতে ওয়াকফ আইন রচিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই আইন অনুসারে, রাজ্য পর্যায়ে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। এখন দেশে মোট ৩২টি ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে শিয়া ও সুন্নিদের পৃথক ওয়াকফ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইনের সামান্য সংশোধন করা হয়। ওয়াকফ বোর্ডগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৬৪ সালে জাতীয় স্তরে ওয়াকফ কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯৬৯ ও ১৯৮৪ সালেও ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইনের অল্পবিস্তর সংশোধন করা হয়। ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন ও তার সমস্ত সংশোধনীগুলো বাতিল করে ১৯৯৫ সালে নতুন ওয়াকফ আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ২০১৩ সালে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের সামান্য সংশোধন করা হয়। ২০২৪ সালের উত্থাপিত বিল তথা ২০২৫ সালের আইনে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের খোল নলচে বদলে ফেলা হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ওয়াকফ আইন বা তার সংশোধনী নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দেয়নি কারণ সেগুলোর উদ্দেশ্য ভালো ছিল। কিন্তু ২০২৪-২৫

সালের ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে আপত্তি করার অনেক কারণ রয়েছে। নতুন ওয়াকফ আইন কয়েক শতাধী ধরে মুসলিম সমাজের দ্বারা গঠিত সম্পত্তি, মুসলিম সমাজের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি এবং মুসলিম সমাজের দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তি থেকে মুসলিম সমাজের অধিকার খর্ব করবে।

এতদিন ওয়াকফ করার দুটি প্রধান পন্থা ছিল (১) মৌখিক অথবা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে ঘোষণার দ্বারা এবং (২) ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ব্যবহারের দ্বারা।সংশোধনী আইন অনুযায়ী, (১) অন্তত পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম অনুশীলন না করলে কেউ ওয়াকফ করতে পারবে না। এই বিধানটির ওপর আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। (২) ওয়াকিফকে ঘোষিত সম্পত্তির মালিক হতে হবে। ব্যবহারকারীর ওয়াকফ করার অধিকার থাকবে না। আদালত এই বিধানটিতে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। 'ওয়াকফ বাই ইউজার' রদ হওয়ার ফলে প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিম সমাজের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, ৮.৭২ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে ব্যবহারকারী দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ ৪.০২ লক্ষ।

সংশোধনী আইনে জেলা কালেক্টরকে ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সালিশকারী হিসেবে ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আদালত এই বিধানটির ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত বিবাদের নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব পালন করবে ট্রাইব্যুনাল ও হাইকোর্ট।

সংশোধনী আইনে বলা হয়েছিল যে, বিতর্কিত ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তা তদন্ত করে রিপোর্ট না দেওয়া পর্যন্ত সেই ওয়াকফ সম্পত্তির স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাবে। আদালত বলেছে, বিতর্কিত সম্পত্তি নিয়ে ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্টের রায় না আসা পর্যন্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে ওই সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাবে না।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সভাপতি হন ওয়াকফের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সভাপতি ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সদস্যকে মুসলমান হতে হয়। কিন্তু ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ অনুযায়ী কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অমুসলিম হওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। পুরনো আইন অনুযায়ী রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের সভাপতি সহ সকল সদস্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু নতুন আইনে দু'জন মহিলা সদস্যের মুসলিম হওয়ার শর্ত ছাড়া সভাপতি সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা সকলেই অমুসলিম হতে পারেন। আদালত এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ওয়াকফ সংস্থাগুলোতে কতজন অমুসলিম সদস্য থাকতে পারবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। আদালত বলেছে যে, একটি ওয়াকফ বোর্ডে তিনজন এবং কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে চারজনের বেশি অমুসলিম সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এর ফলে কাউন্সিল এবং বোর্ড নিশ্চিতভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্থা থাকবে।

সংশোধনী আইনে ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) মুসলিম হওয়ার বাধ্যবাধকতা দূর করা হয়েছে। আদালত এই বিধানটির ওপর স্থগিতাদেশ দেয়নি। তবে আদালত বলেছে, যত দ্রুত সম্ভব এমন একজনকে সিইও নিয়োগের চেষ্টা করা উচিত যিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের। সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, যেসব সম্পত্তি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে সেগুলোর ওপর সৃষ্ট ওয়াকফগুলো বাতিল হয়ে যাবে। আদালত এই বিধানের ওপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

সংশোধনী আইনে উপজাতিদের জমিজমাকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে আদালত এই বিধিতে হস্তক্ষেপ করেনি। সংশোধনী আইনে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধন করার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার ওপর কোনো স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। সহজেই অনুমেয় যে, বহু পুরনো ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করা সহজ হবে না। এর ফলে এতদিন ধরে যেগুলো ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত ছিল নথির অভাবে সেগুলোর মালিকানা বা অধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে।

সংশোধনী আইন ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় এমন ব্যক্তিদের ওয়াকফের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করার অনুমতি দানকারি আইনটি বাতিল করেছে। আদালত সংশোধনী আইনের এই বিধানটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। আদালত বলেছে যে, অমুসলিমরা যদি ওয়াকফের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করতে চান তাহলে তারা প্রথমে কোনো ট্রাস্টে তা দান করতে পারেন যা পরে ওয়াকফ তৈরি করতে পারে।

ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এতদিন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হত। এখন ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা যাবে। পুরনো আইন অনুযায়ী কাউন্সিল ও বোর্ডের সদস্যরা কিছু নির্বাচিত ও কিছু মনোনীত হতেন। কিন্তু নতুন আইনে সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক রীতি। যেমন, শিখ গুরুদ্বার আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে শিখ হতে হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টে সাধারণভাবে কোনো অহিন্দুকে রাখা হয় না। তাহলে মুসলিমদের ওয়াকফ প্রশাসনে অন্যথা করা হচ্ছে কেন? বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমদের ওয়াকফের বিষয়ে একটা চরম অন্যায্য ও অযৌক্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইছে।

সাংবিধানিকভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখা তথা কোনো ধর্মের বিরোধিতা না করার কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মাচরণের সময় রাষ্ট্রের বিরোধিতা, সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন বা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টের কোনো ঘটনা না ঘটলে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার নাক গলাবে না। ওয়াকফ মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত আইনের আওতায় পড়ে। সুতরাং ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপারে সঙ্গত কারণ ছাড়া সরকারের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত নয়। সংবিধানের ২৬ নাম্বার অনুচ্ছেদে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ও পরিচালনার অধিকার সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৭ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় অর্থকে করমুক্ত করেছে। অনুচ্ছেদ ২৯ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুচ্ছেদ ৩০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০০(ক) কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না করার কথা বলেছে। কাজেই বলা যায়, সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে নতুন ওয়াকফ আইনে তা হরণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের জন্মলগ্ন থেকেই চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের বিপদে বা বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করে। মুসলিম সম্পর্কিত একের পর এক ইস্যু তৈরি করে রাজনৈতিক মেরুকরণের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে একত্রিত করতে চায়। আর এস এস-বিজেপির এই অবস্থানের কথা কারোর অজানা নয়। সম্প্রতি সেটাই আরও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বর্তমানে বিজেপির একজনও মুসলিম সাংসদ নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলিম সদস্য নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে বিতর্ক চালানোর পর ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। ধর্মীয় বিধি নিয়ে বিতর্ক বাঁধিয়ে ২০১৯ সালে তিন তালাক আইন তৈরি করা হয়েছে। ওই বছরই কাশ্মীর উপত্যকার বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদানকারী অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মুসলিমদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ করার জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ তৈরি করা হয়েছে। মুসলিমদের মনে নাগরিকত্ব হারানোর ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরির কথা বলা হয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করার কথা ঘুরেফিরে আসে। গোরক্ষার নামে বা গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' নিরীহ মুসলমানদের মেরে ফেলা হয়। মুসলিমদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলা হয়, না বললে পেটানো হয়। হিন্দু পুরুষদের মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করতে উৎসাহিত করা হয়। মুসলিম প্রেমিক ও হিন্দু প্রেমিকার বিবাহ বন্ধনকে 'লাভ জেহাদ' তকমা দিয়ে প্রতারণা ও ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে মুসলিম পুরুষটির জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়। সিনেমার সাহায্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম শাসকদের খুব খারাপ ভাবে চিত্রিত করা অথবা পুস্তক থেকে তাদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়। বিজেপির এই ধারাবাহিক মুসলিম বিরোধিতা ও বিদ্বেষের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি ও তার পরিচালনা পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন আইন। এটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তৈরি একটি বিভেদ সৃষ্টিকারি আইন। গোটা দেশে হাজার হাজার একর ওয়াকফ জমি রয়েছে যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিতর্কিত। মোদি সরকার ওয়াকফ সম্পত্তিকে হস্তগত করে গেরুয়াবাদী ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করছে।

হিন্দুত্ববাদী দল বা সরকার মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যত সক্রিয় হবে মুসলিমবাদী সংগঠনগুলো তত সংগঠিত হওয়ার রসদ পাবে। হিন্দুত্ববাদীরা যেমন চেষ্টা করে হিন্দু জনগণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে তেমনি মুসলিমবাদীরা চেষ্টা করে মুসলিম সমাজে হিন্দুদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করতে। উভয়েই চায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শত্রু মনে করুক। পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হোক। ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ সৃষ্টি হোক। এরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করার বিরুদ্ধে। এরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির বদলে সংঘাত বাধাতে চায়। ধর্মের নামে সংঘাত যত বাড়ে সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত রাখা ও শোষণ করা তত সহজ হয়। মেহনতি মানুষের রুটি রুজির সমস্যার গুরুত্ব নষ্ট হয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। দেশভাগ ও দাঙ্গায় প্রচুর মানুষের প্রাণহানি তারই নির্মম পরিণতি। মানুষকে ধর্মের নামে বিভাজিত করে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার নীতি বা কৌশল আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও অনুসৃত হচ্ছে। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির কথা মাথায় রেখে সরকার বা প্রশাসন যখন কোনো পদক্ষেপ নেয় তখন অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তার বিরোধিতায় সরব হওয়া। ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে সেই আলোকেই দেখতে হবে। আইনসভার আইন কিংবা বিচারব্যবস্থার বাণীর চেয়েও বড় আমাদের বিবেক ও যুক্তিবোধ। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় যুক্তিবোধ আর জাগ্রত বিবেকের বিকল্প নেই।

(লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

বিশেষ ঘোষণা

■ 'জরুরি অবস্থা' সম্পর্কিত নিবন্ধটির পরবর্তী কিস্তি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

■ ২ অক্টোবর সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হবে।